প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা। মে-জুন ২০১৯। ২০ টাকা

ভয়েস মার্ক

এনআরএস কাণ্ড ▸▸বেক্সিট ▸▸ কৃত্তিকার আত্মহত্যা ▸▸ ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট ▸▸ জন্মাষ্টমী তত্ত্ব ▸▸ আর্যসমাজে নেতৃত্বের অভাব ▸▸ সবুজ বিপ্লব ▸▸ প্যারালাইজড সোসাইটি ▸▸ রক্ষণকামিতা ▸▸ মানবতার কর্ষণ ▸▸ বক্তা ও বক্তব্য ▸▸ গল্প ▸▸ কবিতা

ভয়েস মার্ক

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক
মো. ফিরোজ হোসেন

প্রতি সংখ্যার মূল্য ২০ টাকা
গ্রাহক চাঁদা সডাক ১০০ টাকা। যে কোনো সংখ্যা থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।
গ্রাহক পরিষেবায় যোগাযোগ : রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

পত্রিকার যোগাযোগ স্থান

বহরমপুর : ৯৯৩২৮৩৭১৮৫
বর্ধমান : ৮১১৬২৭৯১৫২
বাঁকুড়া : ৯৩৭৮৪৮০১৯২
দ: ২৪ পরগণা : ৮৯২৬৭৪৪১৪০
উত্তরবঙ্গ : ৯৪৩৪৬৫৫৬১০

যোগাযোগ
পিরতলা, উপর ফতেপুর,
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮.
E-mail: voicemark19@gmail.com
Mob: 9434655610

ভয়েস মার্ক

প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা। মে-জুন ২০১৯।

সম্পাদক
মো. ফিরোজ হোসেন
ferozhossain77@gmail.com.
WhatsApp : 9434655610

গ্রাহক পরিষেবা: রনিক পারভেজ, ৯৩৭৮৪৮০১৯২

নামলিপি ও প্রচ্ছদ চিত্র : হিমাদ্রী শেখর মজুমদার

মূল্য : কুড়ি টাকা

মো. ফিরোজ হোসেন কর্তৃক পিরতলা, উপর ফতেপুর, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৪৮ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক কিস অফসেট প্রেস, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ ৭৪২১০১ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়
২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল
সাম্প্রতিক ইশ্যু
এনআরএস কান্ড
'ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন'
কৃত্তিকার আত্মহত্যা
মুক্তবাজার অর্থনীতির সংকটে ব্রিটেন
প্রবন্ধ
জন্মাষ্টমী তত্ত্ব
আযাদ
ঐতিহ্যবাহী সমাজে নেতৃত্বের অভাব
'অস্তিত্ব': বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক
সবুজ বিপ্লব থেকে অতি সবুজ বিপ্লব
অনুপম পাল
'প্যারালাইজড সোসাইটি'র উদবর্তন
কিংশুক সন্ন্যাসী
রক্ষণকামিতা
উজান
মানবতার কর্ষণ
প্রভাস গোস্বামী
বক্তা ও বক্তব্য
শ্যামল কান্তি পাড়ুই
গল্প
রোদ্দুরের রং
বৈশালী রায়চৌধুরী
ছোটোলোক
বরুণ শ্যেন
একটি খুন
সুকৃতি
আবর্তন
তানিয়া খাতুন
কবিতা
আমি মানবতা বলছি
শুভ আহমেদ
বিষ-ফোঁড়া
রঞ্জন পাড়ুই
পাঠকের কলম

সম্পাদকীয়

২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জাতি দম্ভের প্রবণতা প্রকট হয়েছে। আমেরিকা, রাশিয়া, তুরস্ক, জার্মানি, ফ্রান্স সেই দিকেই গিয়েছে। ব্রিটেনের ব্রেক্সিট কেন্দ্রিক ঘটনাগুলি শেষ পর্যন্ত সেই দিকেই এগোচ্ছে। চণ্ড জাতীয়তাবাদী নেতাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এই প্রেক্ষায় ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচন ভারতের প্রবণতাও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

২০১৯ সালের নির্বাচনের মৌলিক অ্যাজেণ্ডায় কী জিতল, কী হারল? একদিকে অর্থনীতির বেহাল দশা, কর্মহারা বেকারত্বের আকাশ ছোঁয়া চেহারা, কৃষি সংকট, তরুণ যুবাদের স্বপ্নহীন হতাশা, ডিমানিটাইজেশনে জনতার অপরিমেয় ভোগান্তি ও কর্মসংস্থান সংকট, দেশীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উপর গুডস অ্যাণ্ড সার্ভিস ট্যাক্সের আক্রমণের ধাক্কা। অন্যদিকে জাতীয় নিরাপত্তা, শক্ত নেতার শাসন, জাতীয়তাবাদের ঢেউ। কর্পোরেট মানি, কর্পোরেট মিডিয়া ও অনিবার্যভাবে ধর্ম-রাজনীতির মিশ্রিত ককটেলে শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় অ্যাজেণ্ডা জয়ী।

ইউপিএ জোট, আঞ্চলিক দলগুলির জোট, লিবার্যাল ডেমোক্র্যাসির চিন্তা ছক এই নির্বাচনে পুরোপুরি ধরাশায়ী হয়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে ভোটের ফলাফলের প্রকৃতি দেখলেই তা বোঝা যায়। সমস্ত সংস্থার সমস্ত সমীক্ষা ভুল প্রমাণ করে নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদির নেতৃত্বাধীন ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার ৪২ টি দলের জোট এনডিএ ৩৫৩ টি আসনে জয়লাভ করেছে। ইউপিএ এর প্রধান দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস জয়ী মাত্র ৫১ টি আসনে। যে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি খারাপ ফল করবে মনে করা হয়েছিল সেখানেও তারা অভূতপূর্বভাবে জয়ী হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের প্রাপ্ত ১৭ শতাংশ ভোট থেকে ২০১৯ এ ভারতীয় জনতা পার্টি ৩৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এখানে তাদের আসন ১৮। কংগ্রেস তার ভোট শতাংশ খোয়ালেও সিপিএম ধুয়ে মুছে গেছে। তাদের ২০১৪ সালের প্রায় ২৭ শতাংশ ভোট থেকে এবার ৭ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রাপ্ত আসন শূন্য।

লক্ষণীয়, আঞ্চলিক দলগুলি যে যে বিষয়ে এতকাল তাদের ভোট শতাংশ ধরে রেখেছিল তা এবারে উড়ে গেছে এই জাতীয়তাবাদী ঝড়ে। দলিত নিম্নবর্গীয় এবং জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ফলাফল তার উদাহরণ। পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রদায়গত বিভাজনের রাজনীতি চরমভাবে মাথা তুলেছে। বাম ও কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির সামনে এনআরসির ভোগান্তি ভোটপূর্ব চিন্তার বিরাট অংশ জুড়ে ছিল। অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেছিলেন এনআরসি জনিত ক্ষতের কারণে এই অঞ্চলে শাসকদল খারাপ ফল করবে। তা হয় নি। সেখানেও এই জাতীয়তাবাদী নয়া চেহেরা সব হিসেব ভুলিয়ে দিয়েছে।

জাতীয়তাবাদী এই রাজনীতি বাধা পেয়েছে একমাত্র দক্ষিণ ভারতে। তামিলনাড়ু ও কেরালায় মুখ্যত।

২০০৪ সালের ঝকঝকে প্রচার, ইণ্ডিয়া সাইনিং হয়ে ওঠার আশ্বাসে দেশবাসীর জীবন যাপনের সমস্যা ভোলাতে পারে নি। পরিণামে বাজপেয়ী পরাজিত হন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষকদের হিসেবে সেই সময়ের অর্থনীতিসহ জনতার জীবন যাপনের সমস্যা প্রভৃতির থেকে গত পাঁচ বছরে ভোগান্তি তো কোনো অংশে কম হয় নি। তা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টি

বিপুল সংখ্যাধিক্যে ক্ষমতায় ফিরেছে। আপাত দৃষ্টে জয়ী হয়েছে সেই বিশ্ব ধারাবাহিকতার জাতীয়তাবাদ। অন্য ভাষায় জাতি দম্ভের রাজনীতি।

আমেরিকার গত নির্বাচনে অর্থনৈতিক সংকট সত্ত্বেও ট্রাম্পের মত উগ্র ও চণ্ড ঝোঁক বিশিষ্ট ব্যক্তি ক্ষমতায় এসে যায়। প্রশ্ন হল দেশে দেশে এই জাতীয় দম্ভ বিশিষ্ট রাজনীতির জয়ী হওয়ার কারণটি কোথায় নিহিত?

মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সম্পদের কেন্দ্রীকরণ ঘটে। আর রক্ষণকামী এই কেন্দ্রীকরণের নিয়মেই অর্থনীতি তখন সংকটে পড়ে। সেই সংকটে রাজনৈতিক চেতনা দানা বেধে গেলে রক্ষণকামের পায়ের তলার মাটি সরে যায়। সেই আতঙ্কে রক্ষণকামকে কোনো না কোনো সেন্টিমেন্টকে আশ্রয় করতে হয়। সেই সেন্টিমেন্টে জনমানসকে বুঁদ করে ক্ষমতা কব্জা করতে হয়। এই কারণেই আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে রক্ষণকাম চণ্ড জাতীয়তাবাদের মোড়কে ক্ষমতার মসনদ প্রাপ্ত। ভারতেরও একই ঘটনা ঘটল ২০১৯ সালে।

ছন্নছাড়া বিরোধী রাজনীতি শাসকদলের এই রকম জয়ে দিশেহারা। তাদের কেউ কেউ ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ফলাফল ঘোষণার অব্যবহিত পরেই। কিন্তু না জনগণের জীবন যাপনের জন্য অত্যবশকীয় কোনো অ্যাজেণ্ডায় তারা গণ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত রাখতে পারছে, না ইভিএম ইশ্যুটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে জনতার চেতনায় সঞ্চারিত করতে পারছে। আসলে জাতীয়তাবাদের চণ্ড রাজনীতির উল্টোপিঠে দাঁড়িয়ে কোন আদর্শ ভিত্তি খাড়া করতে তাদের ব্যর্থতা শাসকদলকে অপরাজেয় করে তুলেছে।

দিকে দিকে পপুলিজমের রাজনীতিতে তাহলে এভাবেই স্থিতাবস্থা চিরস্থায়ী হবে? কখনোই না। আপাত স্থিতাবস্থা। আর পপুলিজমে লোক যায় কেন? জমি আছট পড়ে থাকলে আগাছা জন্মাবেই। চাষ করলে, সেচ, সার প্রয়োগ করলে তাতেই সোনার ফসল ফলে।

আর্থসমাজ মানসের সামনে কোনো আদর্শের দর্পণ না থাকলে তা আছট-ই। সেখানে তার গণচেতনাকে তখন যেকোনো বাদ নামক যা কিছু জনপ্রিয়তার মোড়কে পরিবেশন করলে তা-ই শিরোধার্য হবে। সেই জন্য তথাকথিত লিবার‍্যাল চিন্তাছকের বস্তু বিচ্ছিন্নতার অপসুযোগে জাতীয়তাবাদ মাথা তুলছে পৃথিবীর সর্বত্রই।

তথাকথিত লেফট-লিবার‍্যাল চিন্তা ছকের পার্টিগুলি মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রবক্তা। তার সাথে থাকে ডোল রাজনীতির মিশেল। মানবাধিকার ভিত্তিক কোনো আদর্শে তাদের রাজনীতির ভিত্তি স্থাপিত নয়। তাই দারিদ্র, ধনের কেন্দ্রীকরণ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, প্রথাবদ্ধ জীবনের সামনে র‍্যাশনাল কোনো অ্যাজেণ্ডা দিতে না পারা, ঐতিহ্যের শনাক্তকরণে তার যুপোপযোগী ব্যাখ্যায় উদাসীনতা, সেগুলিকে মিথ বলে উড়িয়ে দেওয়া– ইত্যাদির পরিণতিতেই তাদের এই বস্তু বিচ্ছিন্নতা। যাতে জীবন দর্শনহীন বাজারিপনা আর চিকন কালচার প্রাধান্য পেয়ে যায়। তখন এই শূন্যতা পূরণ করে দিকে দিকে চণ্ড জাতীয়তাবাদ। দিশে হারা মানুষ সেই কূলেই ভিড়ে যায়। এটিই সারা পৃথিবীতে জাত্যাভিমানের রাজনীতির জয়ী হওয়ার প্রধান কারণ। অর্থাৎ দর্শনের দারিদ্র্য!

সমস্যার কাতারে নিমজ্জিত মানুষের নিজ সত্তায় দৃষ্টি পড়ে গেলেই সেই চেতনার মন্থনেই অমৃত রূপ জীবন দর্শন ধরা দিতে পারে। তখন আর্থসমাজে আর আছট পড়ে থাকে না। শুরু হয় জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূলী রাজনীতির চর্চা।

সাম্প্রতিক ইশ্যু

এনআরএস কান্ড স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ নয়, উপসর্গ

গত ১০ই জুন রোগী মৃত্যু এবং পরবর্তীতে রোগীর পরিজন দ্বারা এনআরএস হাসপাতালে দুই ডাক্তার প্রহৃত হন। ডাক্তাররাও মার-পিটে জড়িয়ে পড়েন। একজন জুনিয়র ডাক্তার গুরুতরভাবে মস্তিষ্কে চোট পান। তার চিকিৎসা চলছে,অবস্থা উন্নতির দিকে। এদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআরএস এর জুনিয়র ডাক্তাররা নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতি ও হাসপাতালের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করেন। ধীরে ধীরে আন্দোলন গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্যমন্ত্রী এসএসকেএম হাসপাতালে গিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের দ্রুত কাজে ফেরার কথা বলেন। কিন্তু তার বক্তব্য ও বলার ধরনে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যের সবকটি মেডিকেল কলেজ সহ সরকারি হাসপাতালগুলোতে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। রোগীর মৃত্যু ঘটতে থাকে। শাসকদলের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, রাজ্যের মুখ্য সচিব, স্বাস্থ্য সচিব এনআরএস এ গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ব্যর্থ হন। ইতিমধ্যে সিনিয়র ডাক্তারদের গণ ইস্তফা পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের রাজ্যপাল পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন। দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী পাঁচ জন বিশিষ্ট সিনিয়র ডাক্তারের সাথে নবান্নে আলোচনা করেন। তাদের মধ্যস্থতায় জুনিয়রদের দাবি-দাওয়া নিয়ে নবান্নে এসে আলোচনার প্রস্তাব দেন। আন্দোলনরত ডাক্তাররা তা প্রত্যাখ্যান করে। সিভিল সোসাইটির লোকজন ডাক্তারদের সমর্থনে মিছিল বের করে। অচলাবস্থা চালু থাকে। কর্মবিরতির ষষ্ঠ দিনে মুখ্যমন্ত্রী সন্ধ্যায় প্রেস কনফারেন্স করেন। তিনি জানান ডাক্তারদের সমস্ত দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়া হলো। অবিলম্বে কাজে যোগ দাও। আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো কড়া পদক্ষেপ করবো না। জনস্বার্থের কথা ভেবে কাজে যোগ দেবার তিনি আবেদন জানান। প্রথমে ডাক্তারদের দাবি ছিল নিরাপত্তা, এনআরএস এর আক্রমণে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান। পরবর্তীতে তার সাথে যুক্ত হলো মুখ্যমন্ত্রীর নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা। মুখ্যমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্সের পরে ডাক্তাররা পাল্টা প্রেস কনফারেন্স করে ও কাজে ফিরতে অস্বীকার করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি।

জুনিয়র ডাক্তারদের এ ধরনের আন্দোলন নতুন নয়। আশির দশকে এ রাজ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আন্দোলন দমন করার জন্য এসমা আইন প্রয়োগ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তারদের আন্দোলনে দেশের সমস্ত ডাক্তাররা সলিডারিটি প্রকাশ করেন। অল ইন্ডিয়া মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন ১৭ই জুন দেশব্যাপী ধর্মঘট ডেকেছে।

আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। সমস্যা থেকেই গেছে। আবার কোনো ঘটনায় মাথাচাড়া দিয়েছে। সমস্যার রুটে কী আছে না জানলে সমস্যা সমাধানের রূপকল্প খাড়া করা যায় না। এ অবস্থায় রুটটা একটু দেখা যাক —

১। জাতীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ব্যুরো কর্তৃক প্রকাশিত ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল ২০১৮ থেকে জানা যাচ্ছে আমাদের দেশে ডাক্তার পিছু পপুলেশন এগারো হাজারেরও বেশি। পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তার পিছু দশ হাজার চারশো একচল্লিশ জন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে ডাক্তার পপুলেশন রেসিও এক হাজারের বেশি হওয়া উচিত নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে দেশে কুড়ি লক্ষ নার্সের অভাব। এখন যা আছে তাতে নার্স পিছু পপুলেশন

চারশোর বেশি। এই হল স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হিউম্যান রিসোর্সের হাল!

২। ওই একই সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে বিগত দশ বছরের হিসেবে স্বাস্থ্য খরচের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ রাজ্যগুলি বহন করে, বাকিটা করে কেন্দ্র।

৩। গত পাঁচ বছরে স্বাস্থ্য বাজেট ক্রমশ কাটছাঁট করা হয়েছে। লক্ষণীয় মাত্রায় বৃদ্ধির বদলে কমানো হয়েছে।

৪। বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার নিয়ন্ত্রণ সরকার গুলি করে নি, করছে না।

৫।। স্বাস্থ্য পরিষেবার কর্পোরেটাইজেশন হয়েছে। যার সংক্রমণে মেডিক্যাল এথিক্সের অবক্ষয় হয়েছে।

তথ্য গুলি থেকে কী পাওয়া যাচ্ছে? কর্ম ক্ষেত্রে ডাক্তারদের উপর অমানসিক চাপ। এই চাপে তাদের কাছে মানবিক ব্যবহার কতটা প্রত্যাশা করা যায় আর কতটা প্রাপ্তি ঘটে! এখান থেকে আসে ডাক্তার ও পেশেন্ট পক্ষের পারস্পরিক অবিশ্বাস। সরকারি ক্ষেত্রে ডাক্তারদের কম বেতন, পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে। স্বাস্থ্য প্রযুক্তির বিবিধ ধাপে অর্থ উপার্জনের আঁকাবাঁকা পথের দিকে ডাক্তারদের ঝুঁকে পড়া এই ট্রাস্টকে তলানিতে নিয়ে যায়। ডায়াগনস্টিক্স সেন্টারের সাথে ডাক্তারদের কমিশন-চুক্তি, ওষুধ কোম্পানির সাথে কমিশন-চুক্তি, রেফারাল ডাক্তারের সাথে কমিশন-চুক্তি, প্রাইভেট হেলথ কেয়ার সিস্টেমে মানুষের গলাকাটা। সঙ্গে কর্পোরেটাইজেশন সংক্রামিত ডাক্তার চরিত্রে মিসবিহেভিয়ার, ওভার ট্রিটমেন্ট, আন্ডার-ট্রিটমেন্ট এবং মারাত্মক ওভার-প্রাইসিং ডাক্তার-পেশেন্ট সম্পর্কের ট্রাস্ট পুরোপুরি বিনষ্ট করে। সংস্কৃতি শূন্য প্যারালাইজড আর্থসমাজে অসহিষ্ণুতা, আক্রমণাত্মক হওয়া, সেন্টিমেন্টাল আউট-বার্স্ট মানবিকতাকে ব্যঙ্গ করে। ডাক্তার রোগী দূরত্ব আরো প্রকটিত হয়। সম্পর্কটায় অবিশ্বাস আর অসহায়তা গ্রাস করে। ফলে কোন রোগী মারা গেলে তাৎক্ষণিক ক্ষোভের আউট-বার্স্টে ডাক্তাররা আক্রান্ত হন। পুলিশ দিয়ে প্রাথমিক আক্রমণ রোখা গেলেও সম্পর্ক উন্নত করা যায় কি? পৃথিবীর গণতন্ত্রের পীঠস্থান বলে পরিচিত আমেরিকায় প্রতি বছর ৫০ শতাংশ ডাক্তার মানসিক ও শারীরিকভাবে আক্রমণের শিকার হন। একই ঘটনা ব্রিটেন ও চিনের ক্ষেত্রেও ঘটে।

আসলে প্রশ্নটিই আর্থসামাজিক জীবনশৈলীর। আর্থসামাজিক জীবনশৈলীর? হ্যাঁ আর্থসামাজিক জীবনশৈলীর। নাগরিক চরিত্রে ব্যক্তি জানে কোনটা উচিত আর কোনটা অনুচিত। একই চরিত্রে সে অধিকার কর্তব্য বিস্মৃত নয়। ডাক্তার পেশেন্ট উভয়ই নাগরিক। পেশার আগে নাগরিক হিসেবে তার ভালো মন্দের বিচার থাকতে হয়। আর পেশাগত ক্ষেত্রে সেই ভাল মন্দের দায়বদ্ধতা আইনি বাধ্যবাধকতায় অধিকার কর্তব্যে নির্দেশিত হয়। একই ভাবে রোগীরও সেই দায়বদ্ধতা বর্তায়। যার লক্ষ্যে থাকে সুস্থ ও সুন্দর জীবন শৈলীর বাস্তবতা। তখন গোটা আর্থসমাজ তা ভোগ করে। কিন্তু এই বাস্তবতার প্রতিষ্ঠা ও তার লালন দায়িত্বের আর্থসামাজিক নেতৃত্ব যদি মানবতার বিপরীত মেরুর হয়, তখন গোটা সমাজের ব্যালান্সটাই যায় বিগড়ে। স্বাস্থ্য খাতে বাজেট তখন কমে যায়। ডাক্তার পেশেন্ট রেসিও ভয়ানক হয়। তাৎক্ষণিকতার দানবিক সেন্টিমেন্ট আর্থসমাজকে তখন গ্রাস করে। যা দেশে বারে বারে ঘটে চলেছে। যে মানবাধিকারের দাবিতে ডাক্তাররা আন্দোলনরত সেই একই মানবাধিকার তো রোগীদেরও প্রাপ্য। আর্থসমাজের প্রতিটি মানুষের প্রাপ্য। মানবাধিকার কি শ্রেণি বিশেষে বিশেষিত? না বিশেষিত নয়। তাই ক্ষমতার দরবারে ডেপুটেশন হওয়া দরকার—

১। উপযুক্ত ও যথেষ্ট সংখ্যক মেডিকেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য।

২। জোড়াতালির স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নয়, আধুনিক ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর জন্য।

৩। প্রযুক্তির উৎকর্ষে উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানে দক্ষ জনসংখ্যার পরিমাপে ডাক্তার-নার্সের যোগান ও নিয়োগের জন্য।

৪। ডায়াগনোসিস, ওষুধ ও দাম নিয়ন্ত্রণ সহ স্বাস্থ্য খাতে মুনাফা নিয়ন্ত্রণের সামগ্রিক ও কার্যকর ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য।

৫। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা ও সুস্থ কমিউনিকেশনের জন্য।

৬। কর্তব্য অবহেলার উপযুক্ত বিধি ও তার প্রায়োগিক ব্যবস্থাপনার জন্য।

৭। সার্বিকভাবে সবার নিরাপত্তার জন্য।

এই আন্দোলনে ডাক্তার পেশেন্ট যুযুধান দুপক্ষ নয়। তারা একটিই পক্ষ। তাহলে বিপক্ষ কে? যা আন্দোলনের বিষয়গুলিকে আর্থসমাজে অ্যাপ্লাইড হতে দেয় না। তা সেন্ট্রাল-রিজিওনাল পাওয়ার ব্যাংক। এই পাওয়ার ব্যাঙ্ক কার স্বার্থ সিদ্ধি করে?...

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যনীতি ও বিগত পাঁচ বছরের অতিসংক্ষিপ্ত হেলথ চিত্র দেখে নেওয়া যাক।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল দ্য ল্যাসেট গণতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্যের উপর ১৭০ টি দেশ নিয়ে একটি সমীক্ষা করেছে ২০১৯ সালে। তাদের সমীক্ষায় প্রকাশিত হয়েছে, গণতন্ত্র জনস্বাস্থ্যের জন্য ভাল, উপকারী। যে দেশে গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থাপনা আছে সেখানের নাগরিকের লাইফ এক্সপেকটেন্সী বেশি। সমীক্ষায় আরো উঠে এসেছে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হলে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। এক কথায় গণতন্ত্র ব্যহত হলে তার পরিণাম জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। সেই আলোচনা আপাতত তুলে রেখে দেশের স্বাস্থ্য চিত্রে নজর দেওয়া যাক।

স্বাস্থ্যনীতি ও স্বাস্থ্য বাজেট

স্বাস্থ্য নীতির মূলকথা সবার জন্য স্বাস্থ্য। সব সরকার এটিই দাবী করে। স্বাস্থ্য বাজেটে বিগত পাঁচ বছরের চিত্রটি কী? জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনে বাজেট বৃদ্ধির চিত্রটি একনজরে- ২০০৫-০৯ পর্বে ১৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি, ২০০৯-১৪ পর্বে ৯.৮ শতাংশ বৃদ্ধি, ২০১৪-১৭ পর্বে -০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি। প্রসূতি ও শিশু স্বাস্থ্য খাতে গত পাঁচ বছরে বাজেট বরাদ্দ ৩০ শতাংশ কমেছে। এটি জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কমপোনেন্ট। কমতির ক্রমিক চিত্র- ২০১৭-১৮ সালে বরাদ্দ ১১০০২ কোটি, ২০১৮-১৯ সালে বরাদ্দ ৭৪১১ কোটি, ২০১৮-১৯ সংশোধিত বাজেট ৭৭৪৫ কোটি, ২০১৯-২০ সালে বরাদ্দ ৬৭৫৯ কোটি।

বেসরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবায় লাগামহীন মুনাফা

১১ টি রাজ্য সেন্ট্রাল ক্লিনিকাল এসট্যাবলিশমেন্টস (রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন) অ্যাক্ট, ২০১০ গ্রহণ করেছে। এই আইনে প্রাইভেট হাসপাতালগুলি নিয়ন্ত্রণের বিধান আছে। তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাম নিয়ন্ত্রণ। দাম নিয়ন্ত্রণ বলতে ডায়াগনোসিস বা রোগ নির্ণয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা, ওষুধ, ডাক্তারের ফিজ, ভাড়া প্রভৃতি। এগুলির স্ট্যান্ডার্ড কস্ট নির্ধারণের মত জটিলতম কাজটি কেন্দ্র না করে রাজ্যগুলির উপর চাপিয়েছে। যার ফলে আইনটি কাগজেই রয়ে গেছে। কার্যকর হয় নি। ন্যাশনাল ফার্মাশিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি ২০১৮ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে দিল্লি ও সন্নিহিত এলাকায় বেসরকারি হাসপাতালগুলি কনজুমেবল ড্রাগস ও ডায়াগনস্টিকসের উপর সুপার প্রফিট মারজিনে মুনাফা করেছে। মুনাফার হার ১৭০০ শতাংশ। সংস্থাটি সরকারকে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আর্জি জানায়। সেই আর্জি তো মানা হয় নি, উল্টে তার চেয়ারপার্সনকে প্রতিবেদন প্রকাশ করার জন্য বদলি করে দেওয়া হয়।

সকলের জন্য বিনামূল্যে ওষুধ

স্বাস্থ্য খরচের ৭০ শতাংশ ওষুধের জন্য দরকার হয়। ২০১৪ সালে বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী সকলের জন্য ফ্রি ওষুধের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু গত পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য স্তরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতে মাত্র ১০ শতাংশ ওষুধের বাজার দাম-নিয়ন্ত্রণাধীন। উপরন্তু ২০১৩ সালের ড্রাগস প্রাইস কন্ট্রোল অর্ডার ওষুধ কোম্পানিগুলির জন্য লাভ জনক।

স্বাস্থ্য বিমা

ভারত সরকার স্বাস্থ্য খাতে এই নতুন ইনিশিয়েটিভ নেয় ২০১৮ সালে। এই স্কিমে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় ৫ লাখ পর্যন্ত স্বাস্থ্য বিমার আওতায় ১০ কোটি গরীব পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে এটি ভুলে ভরা স্কিম। কারণ

১) কম বাজেট। ২০১৯-২০ সালে এই স্কিমে বাজেট অ্যালোকেশন ৬৪০০ কোটি টাকা। ৬৪৬ টাকা প্রতি পরিবার। ইনস্টিটিউট ফর ইকনোমিক গ্রোথ এর

গবেষকদের মতে যা প্রতি পরিবার ২৪০০ টাকা হওয়া দরকার। যদি পুরো ফান্ড দেওয়া হয় তাহলে স্বাস্থ্য বাজেটের ৭৫-১০০ শতাংশ এই খাতেই লাগবে।

২) স্কিমে ৪০ শতাংশ এর কম জনতাকে কভার করা হচ্ছে। এটি ইন-পেশেন্ট কেয়ার। যেখানে আউট-পেশেন্ট কেয়ারেই ৭০ শতাংশের বেশি খরচ হয়।

৩) এই স্কিমে আউট-পকেট এক্সপেন্স কমানোর ব্যবস্থা নেই। কেবল ৩ শতাংশ পেশেন্ট ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট পায়। ৭০ শতাংশ পেশেন্টকে আউট-অব-পকেট ১০০০ টাকা খরচ করতে হয়।

৪) এই স্কিমের আওতায় নিবন্ধীকৃত হাসপাতালগুলি প্রধানত মেট্রো ও বড় শহরে অবস্থিত। গ্রামীন ও শহরতলি এলাকায় এর কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাই কার্ড থাকলেও সুবিধা কতটা নেওয়া যাবে তাতে বড় দাগের প্রশ্ন চিহ্ন থেকে যাচ্ছে।

৫) সরকারি হাসপাতালগুলিকে উপযুক্ত পরিকাঠামো দিলে সেখানেই এর থেকে ভাল পরিষেবা পাওয়া যেত। তা না করে পাবলিক মানি প্রাইভেট কোম্পানির প্রফিট হাতিয়ারে পরিণত করা হচ্ছে।

৬) প্রকৃত অর্থে এই স্কিমের বেনিফিসিয়ারি হল বিমা কোম্পানি ও প্রাইভেট হাসপাতাল।

শেষের কথা

অতঃপর, স্বাস্থ্য খাতে কম বাজেটের মাধ্যমে পাবলিক সিস্টেমকে দুর্বল করা, প্রাইভেট ফার্মাশিউটিক্যালস ও হেলথ কেয়ার প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিয়ন্ত্রণহীন মুনাফা প্রমোট করা, স্বাস্থ্য বিমার মাধ্যমে পাবলিক রিসোর্স প্রাইভেট এনটিটিতে চ্যানেলাইজ করা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য নীতির নামে আদপে কার স্বার্থ সিদ্ধ করে তা কি বুঝতে খুব অসুবিধা হয়?

[তথ্য সূত্রঃ ইকোনোমিক অ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২৭ এপ্রিল, ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় ও দীপা সিনহাঃ পেইন্টিং এ পিকচার অব ইল হেলথ, অরিয়েন্ট ব্ল্যাক সোয়ান, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, আনন্দবাজার পত্রিকা, ন্যাশনাল হেলথ প্রোফাইল ২০১৮]

‘ওয়ান নেশন, ওয়ান ইলেকশন’

ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ। কেবল গণতন্ত্র নয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র। আমেরিকার মত দ্বি-দলীয় রাষ্ট্রপতি মুখ্য গণতন্ত্র নয়। নির্বাচন প্রযুক্তিও সেইমতই। প্রাদেশিক নির্বাচনে প্রদেশের আইনসভা অর্থাৎ বিধানসভার সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। মোট সদস্য সংখ্যার সর্বাধিক প্রাপক দল বা দলের জোট প্রদেশের ক্ষমতা অর্জন করে। ক্যাবিনেট গঠন করে। রাজ্যের আইনে পাঁচ বছরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তেমনি সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনে পাঁচ বছরের টার্মে লোকসভার সদস্যদের নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল বা দলের আঁতাত কেন্দ্রের ক্ষমতায় আসে। নির্বাচিত ক্ষমতাসীন দলের সাংসদরা ক্যাবিনেট গঠন করে। তার মুখ্য পদে আসীন হন প্রধানমন্ত্রী। রাজ্যের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী।

ভারতীয় সংবিধান বর্ণিত ধারায় এই পদ্ধতিই অনুসৃত হচ্ছে স্বাধীনোত্তর কালে। সেখানে রাজ্যের বিধানসভা ও কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচন বাইচান্স কোথাও একই সাথে হতে পারে। কিন্তু সব রাজ্যের ক্ষেত্রে তা হয় না। হওয়ার দরকারও নেই। ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের ঠিক পরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি সমস্ত রাজনৈতিক দলের সামনে One nation, One vote– নামে একটি প্রস্তাব রেখেছেন। তাই নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে কি এটি আদৌও সম্ভব? এটি করার প্রয়োজনীয়তাই বা কী? প্রস্তাবটিতে শাসক দলের কোন অভিপ্রায়ই বা নিহিত? (যদিও ২০১৬ সালে তিনি এই স্লোগান দিয়েছিলেন)।

৩০ আগষ্ট ২০১৮ সালে আইন কমিশন এই প্রস্তাব নিয়ে একটি খসড়া প্রতিবেদন জমা দেয়–তাতে One nation, one election system লাগু করতে সংবিধানের কোন কোন অংশ এবং নির্বাচনী অংশের কোন কোন ধারায় চেঞ্জ করতে হবে তাও সাজেশনে উল্লেখ করে।

‘এক দেশ এক নির্বাচন’এ কী বলতে চাওয়া হচ্ছে? রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন আলাদাভাবে অনুষ্ঠিত হয়। যখন রাজ্য সরকারের টার্ম শেষ হয় অথবা সভা ডিজলভ হয়ে যায়, তখন নির্বাচন হয়। এটি কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই টার্ম অর্থাৎ মেয়াদ দুটোর ক্ষেত্রে এক না হতেই পারে। তাতেই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা। যেমন বহু স্থানে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে ২০১৮ সালে, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন হবে ২০২১ সালে।

কিন্তু One nation, one election ব্যবস্থায় এমন একটি পদ্ধতির কথা প্রস্তাবিত হচ্ছে, যেখানে সমস্ত রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন একই সঙ্গে হবে। এটি এমনভাবে সমপতিত হবে যাতে সব রাজ্য ও কেন্দ্রে একই সঙ্গে নির্বাচন হয়। যাতে সমস্ত রাজ্যের ভোটার একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে রাজ্য বিধানসভা ও কেন্দ্রীয় লোকসভার জন্য ভোট প্রয়োগ করবেন।

১৯৬৭ সাল পর্যন্ত দেশে এই পদ্ধতি চালু ছিল। কিন্তু ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সালে কয়েকটি রাজ্যে বিধানসভা ভেঙে যাওয়ায় ও ১৯৭০ সালে কেন্দ্রীয় লোকসভা ভেঙে যাওয়ার পর রাজ্য বিধানসভা ও লোকসভার জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। ১৯৮৩ সালে ইলেকশন কমিশনের প্রতিবেদনে এই সম-নির্বাচন পদ্ধতির পর্যালোচনা ছিল। আইন কমিশন ১৯৯৯ সালের প্রতিবেদনে তা উল্লেখ করে। সাম্প্রতিক সম নির্বাচনের কথা বর্তমান শাসক দল তার ২০১৪ সালের ইস্তেহারে প্রথম উল্লেখ করে। ২০১৬ সালে আবার তা সামনে আনা হয়। ২০১৬ সালে নীতি আয়োগ এর উপরে একটি Writ report তৈরি করে, যা এপ্রিল ২০১৮ সালে আইন কমিশন প্রকাশ করে।

এই প্রতিবেদনে বলা হয়, কমপক্ষে পাঁচটি সাংবিধানিক সংশোধনের প্রয়োজন হবে এটি বাস্তবায়ন করতে।

এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ১৭তম লোকসভার সঙ্গে অর্থাৎ ২০১৯ এর লোকসভার সঙ্গে ১২টি রাজ্যের বিধানসভা ভোট করার প্রস্তাব ছিল। এবং যে সমস্ত রাজ্যের ভোট ২০২১ বা তৎপরবর্তী তাদের ২০২৪ এর লোকসভার সঙ্গে নির্বাচন করার প্রস্তাব ছিল। প্রথমটি সম্ভব হয় নি।

ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে মোটা দাগের যুক্তিগুলি কী কী?

পক্ষে যুক্তি:

১) নির্বাচনের খরচ কমানো যাবে। ২) শাসক দলগুলির সুশাসনের তৎপরতা বাড়বে। ৩) ভোটারের ভোটদানে আগ্রহ বাড়বে।

বিপক্ষে যুক্তি:

১) জাতীয় ও রাজ্যস্তরের ইস্যু আলাদা। একসঙ্গে ভোট করলে ভোটার প্রভাবিত হবে। ২) ৫ বছরে একবার ভোট হওয়ায় জনগণের প্রতি শাসকদলের দায়বদ্ধতা কমবে। ৩) কোনো রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে গেলে সেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে। এটি গণতন্ত্রের পক্ষে বড় আঘাত।

নির্বাচনের খরচ প্রসঙ্গে এত হইচই এর তো কোনো কারণ নেই। এবারের নির্বাচনে মোট খরচ প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে মাত্র ৪-৫ শতাংশ নির্বাচন কমিশন তথা ভারত সরকারের খরচ হয়েছে। বাকি টাকা খরচ করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। রাজনৈতিক দল নির্বাচনে কত টাকা খরচ করবে, তাদের টাকার উৎস কী, কোন দেশি বিদেশি কর্পোরেট গোষ্ঠী কোন দলকে টাকা দিচ্ছে– তা নির্বাচন কমিশন বা আইন সভায় নিয়ন্ত্রণমূলক আইন এনে খুব সহজেই সেই খরচ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। কিন্তু এই প্রশ্নে বর্তমান শাসকদল ইলেকটোর্যাল বণ্ড নামক নতুন বিধি এনে যে কাণ্ড করেছে, তাতে নির্বাচনের খরচ বা দলগুলির টাকার উৎস যাতে গোপন থাকে তার পাকা বন্দোবস্ত করেছে। তারা কি ইলেকটোর্যাল রিফর্মস আসলে করতে চায়? খরচ নিয়ে কি তারা ভাবিত? ভাবিত নয়।

পরপর নির্বাচনে ব্যস্ত থাকতে না হলে শাসকদল সুশাসনে তৎপর হবে– এটি যুক্তি না অপযুক্তি? দলগুলির যা ইডিয়লজি তাতে পরপর নির্বাচনে ব্যস্ত থাকলেই, তাদের সামান্য হলেও জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকে। কিন্তু পাঁচ-শালা বন্দোবস্তে তারা জনগণকে তো থোড়াই কেয়ার করবে!

শাসকদলের 'ওয়ান নেশন, ওয়ান ভোট' প্রস্তাব কার্যত কি দেশকে প্রেসিডেন্সিয়াল মোডে নিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায়? বিশ্লেষকরা এই আশঙ্কায় ব্যক্ত করছেন।

অভিপ্রায় যদি তা নাও থাকে, এই নীতি কীভাবে অ্যাপ্লাইড হবে? যদি কেন্দ্রে অসময়ে লোকসভা ভেঙে যায়? অস্পষ্টভাবে জার্মান নির্বাচন পদ্ধতি যাতে নিরবচ্ছিন্ন সরকার অর্থাৎ If you cannot construct a government, you cannot vote out a government– এই নীতিতে যাবার কথা শাসকদলের প্রবক্তারা বলছেন।

নির্বাচন পদ্ধতির এই পরিবর্তন কি দেশের অর্থনীতির চরিত্রে মৌলিক কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসবে? না। মুক্তবাজার অর্থনীতিকে সরিয়ে সেখানে পরিকল্পিত পথে বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রয়াস হবে? না। তাহলে? এখানেই নিন্দুকদের বক্তব্য শাসকদলের নিজস্ব অ্যাজেণ্ডা বাস্তবায়িত করার জন্য এই থিয়োরি। আর তা হল– সংসদের দুই কক্ষেই মেজরিটি অর্জন করা। দৃশ্যতই রাজ্যসভায় মেজরিটি অর্জন করতে গেলে অধিকাংশ রাজ্যেই ক্ষমতায় আসা চায়। পৃথক নির্বাচনে তা সম্ভবপর নয়। কারণ রাজ্যের অ্যাজেণ্ডায় ভোটার শাসকদলকে ভোট নাও দিতে পারে। সেক্ষেত্রে দুটো ভোট একসঙ্গে করলে একই প্রচারের হিড়িকে রাজ্যের বৈতরণী পেরোবার আশা করা যায়। আর তা হলে সংবিধানের মৌলিক বিষয়গুলিতে শাসকদল তার রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী পরিবর্তন গণতান্ত্রিক ভাবেই করতে পারে।

কৃত্তিকার আত্মহত্যায় আর্থসমাজের দায়

দক্ষিণ কোলকাতার নামি প্রাইভেট স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কৃত্তিকা পালের মুখে প্লাস্টিক ও হাতের শিরা কেটে আত্মহত্যার ঘটনা আর্থসমাজ সংস্কৃতির বে-আব্রু দশার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। [পরিবার সম্পন্ন না হলে নামি বেসরকারি স্কুলে মেয়ে পড়ানো যায় না। অতঃপর এটা স্বতঃসিদ্ধ যে কৃত্তিকার পরিবার সম্পন্ন।] পুলিশ তার দুই পৃষ্ঠার সুইসাইড নোট ও আনুষঙ্গিক অনুসন্ধান করছে। ইতিমধ্যে আদালতে মামলা হয়েছে, স্কুলের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ত্রুটির বিষয়ে। মনোবিদরা মানসিক অবসাদ থেকে এই ঘটনা ঘটেছে বলছেন। অবসাদ কথাটি এসেছে অবসন্ন শব্দ থেকে। অবসন্ন অর্থে মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক ও মানসিক শ্রমজনিত দেহমনের ক্লান্তি। দশম শ্রেণির ছাত্রীর এত শ্রম যে সে অবসাদ গ্রস্ততায় আক্রান্ত! হ্যাঁ, হতে পারে। কীভাবে?

এই প্রসঙ্গে শৈশব-কৈশর হারানো শিশু-কিশোর-কিশোরীদের উপর সভ্যতার অভিশাপ কীভাবে তাদের সেই শৈশব-কৈশরকে দুমড়ে মুচড়ে মানসিক বৃদ্ধে পরিণত করে সেই দিকটি আসুন একটু দৃষ্টিপাত করি।

শিশু জন্মের পর তার সুস্থ দেহমনের বিকাশের দায় বস্তুগতভাবেই পরিবার ও সমাজের উপর এসে যায়। সমাজ যদি রক্ষণকামী মুক্তবাজার অর্থনীতি চালিত হয় তাহলে আর পাঁচটা পণ্যের মতই শিশুর অভিযোজন ক্রম অর্থাৎ শিক্ষাও পণ্য বলেই বিবেচিত হতে থাকে। সেখানে তখন সেই মুক্তবাজারের মুক্ত আবদ্ধতায় একদিকে 'হেলাফেলার সরকারি, আধা সরকারি বা সরকার পোষিত মহল যেমন থাকে, তেমনি তথাকথিত অতি যত্নের ঝাঁ চকচকে বেসরকারী স্কুলও গড়ে ওঠে। শিক্ষা ব্যবসায়ীরা এই ক্ষেত্রটাতেও মুনাফা শিকারে নেমে পড়ে। শ্রম-মূল্যের যথার্থ বিন্যাসহীনতায় গড়ে ওঠা শ্রেণি সমাজের স্বচ্ছল অংশ তাদের শিশুর জড়-ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার প্রতিযোগিতায় তাদেরকে প্রাইভেট স্কুলের কমপিটিশনে পৌঁছে দিতে চায়। দেয়ও। অভিভাবকের দায় ও দায়িত্ব এইটুকুই। শিশুমনের অভিযোজন ক্রমে তাদের জীবনের টুকিটাকি প্রতিটি বিষয়েই যে সেই অভিভাবকের পরিচালনশীলতা মঙ্গলময় ও অতি প্রয়োজনীয়, রক্ষণকামী আবহাওয়ায় আর্থসমাজ মানুষের চেতনাকে প্রভাবিত করার সূত্রে তা তখন তার মনে থাকে না।

অতএব মোটা টাকার বন্দোবস্তে শিশু বেসরকারী চকচকে বিদ্যালয়ের চকচকে ক্লাসরুমের সাজানো সামগ্রী হয়েছে তাতেই তার স্যাটিসফ্যাকশন। মোটা টাকার প্রতিদানে এদের শিশুর বড় রেজাল্টের দায়বদ্ধতা স্কুলের উপর বর্তায়। বাজারের নিয়ম যেমন। প্রতিদানের। তা না হলে তার যে বাজার হাতছাড়া হয়ে যাবার ভয়। অতঃপর শিক্ষাবিজ্ঞানকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শিশুর উপর শুরু হয় নানানও সাবজেক্টের চাপ। ক্লাসটেস্ট, শারীরিক কসরত, নৃত্য, গীত ইত্যাদি সবকিছুই। এককথায়, যদি এটা সম্ভব হত— এমন কোনো মেশিন থাকত যাতে ঢুকিয়ে দিলে রেডিমেড কমপিউটার হয়ে শিশু বেরিয়ে আসতে পারত তাহলে সবথেকে ভাল হত। তো শিশু সেই ভার কতটা নিতে সক্ষম, আর কতটা সক্ষম নয়, তা স্কুলের ভাবার দরকার নেই। অভিভাবকের দায় তো আগেই শেষ হয়ে গেছে। আর বেসরকারী স্কুল যেহেতু মুনাফার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকে, তার সামাজিক দায় বলতে আর কিছু নেই। সেই ফাঁকটাই বাজারের নিয়ম দিয়ে ভরাট করা আছে। পরিণামে কৃত্তিকারা অবসন্ন হলে না অভিভাবক, না সমাজ, না স্কুল কারোরই নজরে থাকে না। কৃত্তিকার মত ফুটফুটে প্রাণ সুন্দর হাতের লেখায় স্পষ্ট সিদ্ধান্তে নিজ গলায় ফাঁস এঁটে সবাইকে ব্যঙ্গ করে সুইসাইড করে।

আর্থসমাজ কি এ থেকে শিক্ষা নেয়? শিক্ষা? কোন শিক্ষা? যে শিক্ষা নিতে গিয়ে কৃত্তিকাকে প্রাণ দিতে

হয়, সেই শিক্ষা? না, সেই শিক্ষা যা বিরুদ্ধ পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। বাজার অর্থনীতির চোরা কারবারে যা প্রাতিষ্ঠানিক সুগম নয়। কিন্তু গৃহ-পরিবারের স্বাতন্ত্রে পরিকল্পিত দাম্পত্য গঠনের মধ্য দিয়ে যা শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত করা যায়। কারণ, রক্ষণকামিতা তার যাবতীয় অপকাণ্ড চালায় প্রাতিষ্ঠানিক ছক্কাপাঞ্জায়। ব্যক্তির বস্তুসম্মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চার স্বাধীনতাকে সে কখনোই হরণ করতে পারে না। তাই কৃত্তিকাদের মত অমূল্য প্রাণকে সুষ্ঠু সুন্দর ভবিষ্যৎ দিতে সুকান্তের কথাটি একটু মনে করুন পাঠক। এ পৃথিবীকে এ শিশুর বাসযোগ্য করার যে প্রত্যয় তার প্রাথমিক অ্যাকশন পয়েন্টে আজ এ মুহূর্তের কর্তব্য বস্তুসম্মত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চর্চা অন্যভাষায় বস্তুসম্মত দাম্পত্য গঠন ও অনুশীলন।

বস্তুসম্মত দাম্পত্যের সাথে কৃত্তিকাদের উজ্জ্বল বাধাহীন ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্ন কীভাবে সম্পর্কিত? সম্পর্ক গোটাটাই। আইনগত ও সামাজিক চুক্তির ভিত্তিতে দাম্পত্য পবিত্র হয় না। দাম্পত্য পবিত্রতার শর্ত দম্পতির প্রেম-দ্বান্দ্বিক বস্তুপ্রিয়তা। নচেৎ আইনি ও আর্থসামাজিক মন্ত্রপড়ার পাতানো সম্পর্কটি জড়দাম্পত্য অর্থাৎ দাম্পত্য কবর।

এই দাম্পত্য কবরের তিনটি লক্ষণ। এক, আরো বেশি অর্থ সম্পদ প্রতিপত্তি; দুই, জড়যৌনতা; তিন, দাম্পত্য সঙ্গীর মালিকানা। দাম্পত্য গঠিত হবার পরে দম্পতির আমিত্ব চর্চা তথা চেতনার কর্ষণ না থাকলে জীবনকে সুন্দর করার জন্য কোনটা প্রয়োজন আর কোনটা অপ্রয়োজন তা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু সত্তার না বাচক দখল কামনায় জড়ভোগের প্রতি লালসা তীব্র হতে থাকে। যার পরিণামে বেশি বেশি অর্থের পেছনে ছোটার নেশা পেয়ে বসে। একই মানসিকতায় তাদের মধ্যে প্রেমহীন যৌনসম্পর্ক প্রাধান্য পেয়ে যায়। আর সেভাবেই চেতনার কর্ষণ না থাকায় মন্ত্রপড়া মানেই একে অপরের মালিক সেজে যায়। অর্থাৎ দম্পতির পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধে। মানে প্রতি মুহূর্তেই হারাবার ভয়। এহেন বস্তুচর্চা বা আমিত্ব চর্চা বা চেতনার কর্ষণ না থাকা কবরী দাম্পত্যে জন্ম নেওয়া সন্তানদের নিয়ে আমরা কী করি? যা করি তার নাম ছেলে মানুষ করার কুস্তি। যে কুস্তিতে শিশুর অভিযোজন ক্রম তার দেহমনের চর্চায় বস্তুসম্মত নজর দেওয়া অর্থাৎ তার জন্য মঙ্গলময় পরিচালনশীল মুক্তাঙ্গন গড়তে আমরা ব্যর্থ হই। তার উপর চাপিয়ে দিতে থাকি কতই না বোঝার ভার। তাকে ক্লাসে ফার্ষ্ট হতে হবে। তার সঙ্গীত, নাচ, ক্যারাটে সব কিছুই চর্চা থাকতে হবে। তার প্রবণতা কীসে তা জানার দরকার কী? সে কী খাবে? কোন পোশাক পরবে? কে তার বন্ধু হবে? এইভাবেই আমাদের নিজেদের জড় দাম্পত্যের জড়মনের যা কিছু চাহিদা তা দিয়ে তার সুকুমার মনের কুঁড়িগুলিকে দলে পিষে দিই। তারপর একদিন সে যখন তা সইতে না পেরে জীবনকে ব্যঙ্গ করে কৃত্তিকার মত বিদায় নেয়, তখন সেই কুরুক্ষেত্রে নিজেদের চেহেরাটা কি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়? হলেও তখন বস্তু বিচ্যুতি অর্থাৎ আমিত্ব বিস্মৃতি থেকে জন্ম নেওয়ার আমিত্ব প্রতারণা কী আমাদের ছেড়ে দেয়? দেয় না।

তাই রক্ষণকামী মুক্তবাজার অর্থনীতির যাঁতাকলে পিষ্ট দম্পতি বা উড বি দম্পতিদের সামনে অতঃপর করণীয়? করণীয় একটিই, তা হল বাস্তবানুগ দাম্পত্য গঠন। যে দাম্পত্য পরশবাচক প্রেম দ্বান্দ্বিক বস্তুপ্রিয়তা মুখ্য ভূমিকা নেয়। তাহলেই দাম্পত্য সঙ্গীর চেতনা কর্ষণ অর্থাৎ আমিত্ব চর্চা অর্থাৎ প্রেম চর্চায় কী করণীয়, কতটা করণীয়, ছেলেমানুষ করা কী সবটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর সেই দাম্পত্যই মেধা-প্রতিভার সূতিকাগার। তখন কৃত্তিকাদের মত প্রাণ অকালে ঝরে যায় না।

মুক্ত বাজার অর্থনীতির সংকটে ব্রিটেন

গণভোটে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত এবং তৎপরবর্তী জটিলতায় প্রধানমন্ত্রী টেরেসা মে পদত্যাগ করেছেন। ব্রেক্সিট কী এবং কীভাবে তা বাস্তবায়িত হবে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার ফলে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ডেমোক্র্যাসিগত, কালচারাল কী সুবিধা বা অসুবিধা হচ্ছিল এসকল প্রশ্ন এই নিবন্ধের আলোচ্য নয়। এই গণভোটের পরে ব্রিটেন কি ইউরোপীয় ইউনিয়নে আবার যুক্ত হতে পারে ইত্যাদি টেকনিক্যাল জটিলতাগুলি নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, হচ্ছে। কিন্তু সমাধানটি বের হচ্ছে না। মাঝখান থেকে দু-দুজন প্রধানমন্ত্রীকেও পদত্যাগ করতে হল। আমাদের আলোচ্য সেটিও নয়। আমাদের আলোচ্য যে কারণে এই ব্রেক্সিট, সেই কারণটি নিয়ে। ব্রিটেন কেন ব্রেক্সিট করতে চাইছে? ব্রিটেনের জনগণ গণভোটে কেন ব্রেক্সিটের পক্ষে রায় দিল?

ওয়ার উইক ইউনিভার্সিটির সমীক্ষকদের হিসেব অনুযায়ী ব্রিটেনের যে সমস্ত অঞ্চল শিক্ষা, আয় ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে পিছিয়ে আছে, তারা ব্রেক্সিট এর পক্ষে ব্যাপকভাবে রায় দিয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রভাব সম্পন্ন অথচ কম কর্মসংস্থান, বা কর্মস্থান থাকলেও দক্ষ শ্রমশক্তি নেই, সেই অংশ থেকে ব্রেক্সিট রায় তীব্রভাবে এসেছে। যারা সামাজিক অবস্থানে নিম্ন তারা ব্রেক্সিট এর পক্ষে, যাদের সামাজিক অবস্থান অপেক্ষাকৃত উচ্চ তারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার পক্ষে ভোট দিয়েছেন।

লণ্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্সের গবেষকদের মতে কসমোপলিট্যানিজম বিরোধী কনজারভেটিভ ও রাজনৈতিক অর্থডক্সি এবং যারা মনে করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার ফলে ব্রিটেনের জীবনমান নিম্নগামী তারা ব্রেক্সিটের পক্ষে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় উঠে এসেছে– ১) ভালো ইমিগ্রেশন পদ্ধতি, ২) সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ, ৩) স্বচ্ছ জনকল্যাণ পদ্ধতি, ৪) উন্নত জীবনমানের দাবী এবং নিজেদের আইন নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করব– এগুলিই ব্রেক্সিট এর ভিত্তি। যারা ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকতে চায় তাদের যুক্তি– ১) অর্থনীতির পক্ষে ভাল, ২) আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সুবিধাজনক, ৩) পৃথিবীতে ব্রিটেনের প্রভাবের জন্য প্রয়োজনীয়। ভোটে দেখা গেল ব্রেক্সিটের পক্ষে জনতা যে প্রধান কারণে ভোট দিল তা হল– ১) ব্রিটেনের সিদ্ধান্ত ব্রিটেনেই নিতে হবে, যাতে ব্রিটেন ইমিগ্রেশন পলিসি ও তার সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ নিজেই করতে পারে। ২) অর্থনীতি, কর্মসংস্থান ও দাম।

অর্থনীতিবিদদের বৃহত্তর ঐক্যমত হল ব্রেক্সিট এর ফলে ব্রিটেনের প্রকৃত মাথাপিছু আয় মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদে কমবে। পরিণামে ব্রেক্সিট গণভোটের ফল ব্রিটেনের অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করবে। গণভোটের পর থেকেই জিডিপি নিম্নমুখী, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির লক্ষণগুলি ফুটে বেরুচ্ছে। ব্রেক্সিট এর ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলি থেকে ইমিগ্রেশন কমবে ফলে ব্রিটেনের উচ্চশিক্ষা ও অ্যাকাডেমিক রিসার্চে তার প্রভাব পড়বে। শুধু তাই নয় ব্রিটেনের সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির বাণিজ্যিক চুক্তি এবং আয়ারল্যাণ্ডের সাথে সম্পর্ক অনিশ্চয়তায় পড়ে যাবে।

তথ্যগুলি থেকে যা উঠে আসছে তাতে কি বলা যায় না ব্রিটেনের আর্থিক সংকট? ইউরোপীয় ইউনিয়নে থাকার মধ্য দিয়ে ব্রিটেনকে এতদিন ধরে গড়ে উঠা সীমান্ত নিরাপত্তা, অর্থনীতি, ইমিগ্রেশন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক ইত্যাদির সমস্ত কিছুই ঢেলে সাজাতে হবে। এত বড় ঝুঁকি ব্রিটেন কেন নেবে?

আসলে ইতিমধ্যে অর্থনীতির মূল সমস্যা থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরাতে ফারাজ এর মত নো ডিল ব্রেক্সিটপন্থী নেতাদের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। একটি অতি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা জিইয়ে তোলা হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত নো ডিল না ডিল সেটি সময় বলবে, কিন্তু ব্রিটেন যে মহা গাড্ডায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তাই ঝাঁ চকচকে গণতন্ত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতি কীরূপ সংকটে পড়ে তার দৃষ্টান্ত ব্রিটেন। আর তাই রক্ষণকামী বাজার অর্থনীতির চোরাবালিতে ডুবতে থাকা ব্রিটেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের থেকে বেরিয়ে এলেই সেই অর্থনীতি তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে, তা নৈব নৈব চ। মাঝখান থেকে তথাকথিত গণতন্ত্রের পিঠস্থান ব্রিটেনকে যে চন্ড জাতীয়তাবাদ গ্রাস করবে না তা কি খুব জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে? ব্রেক্সিট নিয়ে চরমপন্থী নো ডিল এর প্রবক্তাদের প্রভাব বৃদ্ধি সেই দিকটিতেই ইঙ্গিত করছে।

প্রবন্ধ

জন্মাষ্টমী তত্ত্ব বা 'রা'-'ধা' প্রযৌক্তিক শ্রীকৃষ্ণ তত্ত্ব

আযাদ রহমান

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপ্যাধ্যায় তাঁর সাহিত্য কীর্তিতে নিঃসন্দেহে বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর সাহিত্য কীর্তির অনন্য অঙ্গ 'কৃষ্ণচরিত' গ্রন্থ। পুরাণ কাহিনীতে, মহাভারতের কাহিনীতে, পরবর্তী যুগের নানান কবির রচনায় কৃষ্ণ চরিত্র আসমুদ্র-হিমাচল ভারতীয় মানসে প্রথিত হয়েছে যুগযুগ ধরে। তার কতই না বিচিত্র রকমফের। যেখান থেকে কৃষ্ণ চরিত্রের মর্ম উদ্ধার নিতান্তই জটিলতম ও প্রায় অসাধ্য কর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু কাব্য কাহিনীর বহু যুগের জঞ্জালে হারিয়ে যাওয়া বা বহুস্তর কয়লার তলায় চাপা পড়া কৃষ্ণ চরিত্রকে সাহিত্য প্রতিভা পুরোটা না হলেও অনেকটাই উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁর 'কৃষ্ণচরিত' গ্রন্থে। যদিও ঐতিহাসিকতা অনুসন্ধানের পণ্ডশ্রম জনিত কারণে গ্রন্থের মূল প্রসঙ্গ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'কৃষ্ণচরিত' গ্রন্থের সমালোচনায় সেটি উল্লেখও করেছেন। কিন্তু মনীষী কী করতে পারেন নি তাই দিয়ে তো তাঁর বিচার চলে না, যুগের প্রেক্ষায় নতুন কী দিয়েছেন তাই দিয়েই তাঁর মূল্যায়ন হয়। এটিই বস্তুসম্মত মাপকাঠি। সেই মাপকাঠি থেকে অতি অবশ্যই ভগবান রূপে পূজিত ও একই সঙ্গে লম্পট রূপে চিত্রিত চরিত্রটিকে তিনি পুরাণ ও মহাভারতীয় স্পিরিট অর্থাৎ আর্য চিন্তার বস্তুগত মর্মের অনুসারি করে উদ্ধার করতে অনেকটাই সমর্থ হয়েছেন।

ভারতীয় দর্শনের মূল সূত্রগুলি যা পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ও মহাকাব্য যথা রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমে মানব আমিত্ব গঠনার্থে চিত্রিত, চিহ্নিত ও সংকলিত হয়েছিল তার সবটাই তত্ত্বগত। কিন্তু সেই জ্ঞানের রাজনৈতিক প্রয়োগ অর্থাৎ আর্থসামাজিক বাস্তবায়ন কখনোই কোনো যুগেই হয়নি। পরিণামে যুগে যুগে রাজনৈতিক ক্ষমতা তার চরিত্র অনুযায়ী সেই ক্ষমতার রক্ষণকামী রক্ষণে ও সম্প্রসারণে তত্ত্বগুলিকে তথ্যরূপে বিকৃত, খর্বিত, প্রক্ষিপ্ত করেছে। যে কারণে পুরাণ ও মহাভারতীয় মৌলচরিত্র কৃষ্ণকে নিয়েও সেই একই ঘটনা। যেখানে গ্রন্থগুলির মৌল তত্ত্বভিত্তি সরিয়ে নিলে যা থাকে, তাতে কোনো ভাবেই মানুষ তার নিজ চরিত্রের গাঠনিক উত্তরণ ঘটাতে সমর্থ হয় না। বরঞ্চ সেগুলি মিথ রূপে মানুষের মন ও মস্তিষ্কে ঐতিহ্যের আবরণে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে নেয়। তাতে কার লাভ কার ক্ষতি? তাতে আর্থসমাজ মানবতা অবনমিত হয়। ঐতিহ্যের আবরণে আবৃত আর্থসমাজ চেতনা যুগ সংকট নিরসনী নেতৃত্বের জন্ম দিতে পারে না। পরিণামে সমকালীন রক্ষণকামিতাকে পরাজিত করা সম্ভব হয় না। শ্রমে অর্জিত মূল্যের যথার্থ বিন্যাস হীনতায় ঋষি দর্শিত মুষিক ঐরাবতী শুঁড়ের মাধ্যমে তা কুবেরের করতল গ্রস্ত হয়। ধনের এই কেন্দ্রীকরণে আর্থসমাজ তখন দুর্যোধনে সংক্রামিত। এই দুর্যোধনের থেকে আর্থসামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা তখন দূর অস্ত।

কিন্তু কৃষ্ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ অষ্টম গর্ভ বা জন্মাষ্টমী তত্ত্বের রা-ধা প্রযুক্তিতেই এই আর্থসামাজিক জীবন মুক্তি সম্ভব। জন্মাষ্টমী তত্ত্ব ছাড়া যা লাভ করা যায় না। এই জন্মাষ্টমী তত্ত্ব কী?

সত্তায় ডুবোত্থিত চেতনার প্রত্যয়েই জানা যে প্রতিটি মানুষই কৃষ্ণ। যে কারণে এই কৃষ্ণের উল্লেখ কয়েক শো এমনকি হাজার বছরের ব্যবধানেও পুরাণে উল্লেখ থাকে। কৃষ অর্থে কর্ষণ আর ণ অর্থে আনন্দ। অর্থাৎ

কৃষ্ণ অর্থে আনন্দ বা সুখ আকর্ষণী সত্তা। এই কৃষ্ণ থেকে শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ শ্রী অর্জন তত্ত্বই জন্মাষ্টমী তত্ত্ব। আর এই তত্ত্বের প্রযুক্তি রা-ধা।

কী এই শ্রী-কৃষ্ণ আর রা-ধা?

প্রথমেই উল্লেখ্য যে মানব কৃষ্ণের চেতনার সাতটি স্তর। অচেতন, চেতন, দৃষ্টি, প্রেম, দ্বন্দ্ব, দহন ও মুক্তি। রা অর্থে মুক্তি আর ধা অর্থে অধিষ্ঠান। এই রা-ধা প্রযুক্তিতে চেতনার সপ্তস্তর অতিক্রমেই পরম সৌন্দর্য মণ্ডিত শ্রী বস্তুর বাস্তব যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। তখন আর কৃষ্ণ নয় শ্রীকৃষ্ণ।

কৃষ্ণ অর্থে প্রতিটি মানুষ। এই মানুষের সত্তা স্বরূপে কাল বিশেষণাবিষ্ট অচেতন থেকে উঠে এসে চেতন, পরবর্তীতে নিজের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। এই দৃষ্টিতে নিজেরই স্বরূপের নেগেশনের প্রকৃতি তার কাছে পরিস্ফুট ও চিহ্নিত হয়। একই সঙ্গে সেই সত্তার ইতিবাচক শক্তি অর্থাৎ আমিত্বের অনুভূতি পরিস্ফুট হয়। যাতে আমিত্বের প্রতি প্রেমে চেতনার নেগেশনকে আমিত্বিকভাবে দহন অর্থাৎ পুড়িয়ে মুক্তি পর্যায়ে আসতে হয়। এই চেতনার সপ্তম স্তর অর্থাৎ আকাশ অতিক্রমে চির বর্তমান কালাতীত পরম বস্তুত্ব অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ অর্জিত অধিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত হয়। এই শ্রীমণ্ডিত চেতনা আর কৃষ্ণরূপী আপেক্ষিক মানব চেতনা এক নয়। শ্রীকৃষ্ণ চেতনা অনাপেক্ষিক। তা দেহে অর্থাৎ জড়ে আবদ্ধ হলেও জড়ের বৈশিষ্ট্য বা বিশেষণ অর্থাৎ কাল বিশেষণাবিষ্ট নয়। এই চেতনার কাছে মানব দেহ সহ গোটা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান প্রতিভাত হয়। এই প্রতিভাত হওয়া অর্থাৎ Revelation অর্থাৎ দর্শন অর্থাৎ ওহি তা কোনো চিন্তা ভাবনার ফসল নয়। এই প্রাপ্ত জ্ঞান অবরোহ পদ্ধতিতে লভ্য। যে জ্ঞান প্রাপ্তির পদ্ধতি জড় বুদ্ধিচার্চিক ইউরোপীয়গণ অনুধাবন করতে পারেন নি বলে Orient তার কাছে এত অজানা। যতই তারা সেই জ্ঞান সূত্রেই অনুবাদ, ব্যাখ্যা, ভাষ্য রচনার কাজ করুক না কেন। ইউরোপীয় চিন্তনের বৈশিষ্ট্যে প্রকট জড় মস্তিষ্ক চর্চা। যার ফলে যিশুর জীবনমন্থিত জ্ঞান ভাষ্যও তাদের কাছে অবোধ্য। আল কোরানের জ্ঞানতত্ত্বও অবোধ্য। যে কারণে তারা রাসুলুল্লাহকে Epileptic আক্রান্ত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করে। যে কারণে অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্বের কাহিনী রূপ মহাভারত ও তার সূত্রকার অবোধ্য। সেই একই কারণে অখণ্ড নয় কিন্তু অখণ্ডতামুখীন হতে গিয়েও না পারা রামায়ণের জ্ঞান তত্ত্বও তাদের কাছে বোধগম্য নয়।

এই প্রসঙ্গে পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ও মহাকাব্যে বর্ণিত জ্ঞানতত্ত্বের বিবিধ বিষয়গুলিকে তথ্যে রূপ দিলে তা কি মানব জাতির কোনো কাজে লাগে? লাগে না। তাই সেই তথ্যকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের গল্প কাহিনি ফাঁদা যায়, তা দিয়ে জীবন বৈতরণী পেরনো যায় না। তা থেকে পূণ্য অর্থাৎ জীবনকে সুন্দর করার জ্ঞান-ভিত্তিক উপলব্ধিতে পৌঁছাতে পারে না। ফলত তা তাদের কাছের কেবলই সেন্টিমেন্টের ইন্ধনী মাত্র। তাই সেই গতানুবর্তিক মানুষের কাছে বা তার আর্যসমাজের কাছে যখন অর্বাচীন জয় শ্রীরাম শ্লোগান এসে যায় সেই সেন্টিমেন্টকে খোঁচাতে, তখন সেই আর্যসমাজ মন তার যথার্থ বাচক বিশ্লেষণে তা যে ভারতীয় বস্তুবাদী দর্শনতত্ত্বের বিরোধী সেকথা তারা উত্থাপন করতে পারে না। তারা বলতে পারে না, জয় শ্রীরাম নয়, জয় শ্রীকৃষ্ণ। রাম নেতৃত্ব পূর্ণতামুখীন হতে গিয়েও বিচ্যুত হলে সীতা অধরা হয়ে যায়, তার হাতে স্বপক্ষীয় বালি নিধন ঘটে, গণজনতার প্ররোচনায় বস্তুবিচ্যুত রাম সীতার অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় অবস্তুর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। যার পরিণামে সীতা পাতালগামী হয়। অর্থাৎ আর্যসমাজ শান্তিহারা হয়। তাই রাম বস্তুতে পরাজিত হন। এই রামায়ণেরই ওভারকাম তত্ত্ব হল মহাভারত। মহাভারতের অখণ্ড তত্ত্বে শ্রীকৃষ্ণের নেতৃত্বে তাই পাণ্ডবরা বিজয়ী হয়। তাদের বস্তু বিচ্যুতি হয় না। কুরুক্ষেত্রের ময়দানে কৌরবদের পরাজয় বরণ করতে হয়। আর যুধিষ্ঠিরসহ দ্বান্দ্বিকরা আর্যসামাজিক শান্তি-স্বর্গ নির্মাণ করেন ও তা সকলেরই ভোগ্য হয়।

মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পাই। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন বা তুলবেন যে তিনি যেন অনেকটা রেডিমেড চরিত্র। পূর্ণ, ভগবান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে কুরুক্ষেত্রিক যুদ্ধে পাণ্ডবরা বিজয় অর্জন করে। কিন্তু এই সমালোচকরা ভুলে যান আর্য চিন্তার মৌলিকতা।

যেখানে কৃষ্ণের সাতটি জন্ম পুরাণের কাহিনীতে বর্ণিত। অষ্টম গর্ভ মহাভারতে। অষ্টম গর্ভ অর্থাৎ মহাবস্তুলক্ষ্য অর্জিত শ্রী অর্থাৎ পরম সৌন্দর্য মণ্ডিত 'শ্রী'কৃষ্ণ তাই রেডিমেড হঠাৎ করে এসে হাজির হন না। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণের আগে মানবকৃষ্ণকে অনেক রকম অসুর বধ করেই তার মানবসত্তার ব্যক্তিত্বে রণকৌশলী রণবীরত্ব অর্জন করতে হয়। জীবন শিল্পের বাস্তবায়ন করতে হয় আমিত্বচেতনার 'রা'-'ধা' প্রযৌক্তিক কৃষ্ণলীলায়। যে লীলায় স্বত্বশিল্পে বধ করা হয় ব্যক্তি আবর্তিক অসুর যেমন— দেহের জীবাণুরূপ অঘাসুর, মঘাসুর, দেহমনের ঈর্ষারূপ কালীয়নাগ ইত্যাদি। আর রজোশিল্পের ঘোষণায় সমকালীন আর্থসমাজ মুক্তি ও সেই আর্থসমাজ মুক্তির বিরোধিতারই আবর্তিক মহিষাসুর। এই বস্তুগত পদ্ধতিতেই চেতনার স্তর অতিক্রমী অর্থাৎ পুরাণ অতিক্রমী রা-ধা প্রযৌক্তিক অধিষ্ঠিত হন। যে চেতনা অক্ষর, যা কালভেদী অকাল। এই তত্ত্ব অনুধাবনে তাই প্রয়োজন পুরাণ, বেদ, উপনিষদ ও মহাকাব্য দ্বয়ের অখণ্ড রিডিং। এই রিডিং আমিত্বিক বস্তুপ্রিয় হলে অবশ্যই মানব কৃষ্ণের 'শ্রী'কৃষ্ণত্ব অর্জন রেডিমেড বলে মনে হবে না।

পুরাণ, বেদ, উপনিষদ কী এবং কীভাবে?

... 'পুরাণ হল মানুষেরই সত্তান্দরী বিষয়ের দেহমন চার্চিক ঋষিত্ব প্রজ্ঞায় উপলব্দ বিষয়ান্তরী বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক কাহিনীরূপ। বেদ হল সেই জ্ঞানের প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তরূপ। অর্থাৎ ঋষি ভাবলেন, ভাবের ভাবান্তর ভাবনিগম করলেন। ঋষির এই ভাবকল্পই পুরাণ, যে ভাবকল্পকাল একটি ক্ষণও হতে পারে ক্ষণের প্রবাহও হতে পারে। তারপর তিনি বললেন। তাত্ত্বিক সূত্রে তাঁর যে বলাটিই বেদ। ঋষির এই সূত্রবন্ধ বাণীতে তাঁর বস্তুকল্প কাহিনীর চরিত্র যেমন আদিতে, তেমনি অনাদি বৎ অনন্তেও। আর এই জন্যই তাঁর বস্তুকল্প কাহিনীর সূত্রায়িত অনেক চরিত্রকে শত সহস্রাধিক বছরের ব্যবধানেও দেখা যায়, লক্ষাধিক বছরের ব্যবধানেও দেখা যায়। চিরায়ত তত্ত্বের এই প্রজ্ঞায় অখণ্ড জীবানানুগ পন্থালব্ধির প্রায়োগিক সিদ্ধান্তই উপনিষদ, যা কাল পাত্র ক্ষেত্রিক ইতিহাস সৃষ্টিতে ঘটিতব্য ঘটনার ইঙ্গিতবাহী।' (অস্তিত্ব)

গণ্ডি হল রক্ষণকামিতার প্রতীক তত্ত্ব। মানুষের এই রক্ষণকামিতা থেকেই সংক্রামিত হয় রাক্ষস বা দানব। এই সংক্রমণে যেখানে হারাবার ভয় সেখানেই গণ্ডি। রামায়ণের এই তত্ত্বে বাল্মিকী দেখিয়েছেন গণ্ডিবদ্ধতায় সীতা অর্থাৎ আর্থসামাজিক শান্তি উদ্ধার করা গেলেও বস্তুতে তা টেকে না। আর মহাভারতে গণ্ডিবদ্ধতার কোনো ট্রেস কি দেখা যায়? না, দেখা যায় না। এখানে মানব কৃষ্ণের বস্তুপ্রিয় আমিত্ব শ্রীলক্ষ্য শ্রীকৃষ্ণের লক্ষ্যাভিমুখী পাণ্ডবরা কুরুক্ষেত্রিক যুদ্ধে বিজয় অর্জন করে এবং দ্রৌপদী অর্থাৎ অগ্রসর আর্থসমাজের ভোক্তা হয়।

এইখানে 'রা'-'ধা' তত্ত্ব আর কবি কাহিনির রাধা-কৃষ্ণ নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। উৎপাদন তথা শ্রম সম্পর্ক বিধৃত আর্থসমাজে শ্রম-উৎপাদন-মূল্য-মূল্যবিন্যাস তথা আবশ্যিক ও উদবৃত্তে বিভাজন ও উদবৃত্তের আর্থসামাজিক বিন্যাসে আর্থসামাজিকভাবেই মানুষকে চেতনার কর্ষণ করতে হয়। আর এই চেতনার কর্ষণেই চেতনার গণ্ডিবদ্ধতা দূর হয়। চেতনার মুক্তি ঘটে। চেতনার এই মুক্তিই 'রা'। এই 'মুক্তি' অর্থাৎ 'রা' মানবের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বাচক 'ধা' অর্থাৎ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। এই অধিষ্ঠিত চেতনা হল শ্রীকৃষ্ণ। যা অনাপেক্ষিক, যা চিরায়ত।

চেতনা কর্ষণে প্রতিটি ব্যক্তিই কৃষ্ণ। আর কর্ষিত চেতনার বাস্তবায়নে আর্থসমাজের পরিচালক সব মানুষই রাখাল। এই রাখাল চেতনাই রা-ধা প্রযুক্তিতে মহাশ্রষ্টার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ এই প্রযুক্তিতেই কৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে উন্নীত হয়, যা চিরায়ত। কিন্তু 'রা' আর 'ধা' প্রযুক্তিকে শব্দরূপে জুড়ে দিয়ে তাকে নারী হিসাবে চিত্রিত করলে, কৃষ্ণ আর রাধা কে নিয়ে কল্প কাহিনীর গল্প ফাঁদলে তা কি জীবনের বস্তুগামী লক্ষ্যকে নিকটবর্তী করে, না তার জীবন লক্ষ্যকে কিম্ভূতকিমাকার করে দেয়? নিশ্চয় তা মানুষকে তার জীবন লক্ষ্য বিচ্যুত করে। অর্থাৎ রা-ধা কোনো দেহগত নারী নয়। কমনীয়তার আদল বলে

কমনীয়তা বা আনন্দ স্বরূপ বোঝাতে তত্ত্ব পরিবেশনে নারী অবয়ব আঙ্কিত হয়েছে– যেমন দূর্গা, সীতা, দ্রৌপদী ইত্যাদি।

চেতনার কর্ষণ প্রযুক্তিতে আর্থসামাজিক সিদ্ধান্ত নিলে আর্থসমাজে আনন্দ ছন্দ জাগে। এটিই কৃষ্ণের বাঁশির ফুঁ, আর বাঁশির সুরে রাধা নাচে– এর তত্ত্বার্থ। আয়ান হল রক্ষণকামিতায় বন্দি মানুষ তথা আর্থসমাজ। রক্ষণকামিতায় বুঁদ হয়ে থাকলে মানুষের চেতনার কর্ষণ হয় না। অর্থাৎ রক্ষণকামী আর্থসমাজ চেতনা বাঁশিতে ফুঁ দিলেও বাঁশি বাজেনা মানে রক্ষণকামিতার গৃহীত সিদ্ধান্ত নন্দন বাচক হয় না। অর্থাৎ আয়ান হল মনের তথা আর্থসমাজ সত্তার আবদ্ধতার প্রতীক। আর মুক্তিপ্রিয়তার প্রতীক হল 'রা' অন্তরাপ্লুত 'ধা' মানে 'রা'-'ধা'। এই 'রা'-'ধা' প্রযুক্তিতে মানুষ তার সত্তার্গল ভেঙে বেরিয়ে আসতে চাইলেই তার সামনে আয়ানরূপী ঐতিহ্যবাহী অবরুদ্ধ আর্থসমাজ বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

তাহলে আয়ানরূপী অবরুদ্ধ আর্থসমাজকে কীভাবে মুক্ত করা যায়? তা করা যায় জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল প্রযুক্তিতে। এই জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রামের ত্রিশূল আঘাতে নিজেরই মর্মভেদী চেতনার বস্তু প্রত্যয়িত আমিত্ব স্বরূপই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ। অর্থাৎ কৃষ্ণ যেভাবে শ্রীকৃষ্ণত্ব অর্জন করেন, সেই একই পন্থায় আর্থসমাজের প্রতিটি মানুষকে তার আয়ান রূপের উত্তরণ ঘটিয়ে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদর্পণে নিজেকে অভিষিক্ত করতে হয়। সেই রাস্তায় থিসিস-অ্যান্টি থিসিস-সিনথিসিস এর দ্বান্দ্বিকতায় মহাভারতীয় পাণ্ডবদলের মত কৌরবরূপী আর্থসামাজিক অচলায়তনের দুর্যোধনরূপ জঞ্জাল পরিচ্ছন্ন করতে হয়। আর্থসমাজ হয়ে ওঠে আমিত্ব চেতনার নন্দকানন। সেই উন্নততর আর্থসামাজিক বর্তমান অর্থাৎ দ্রৌপদী তখন আর্থসমাজের ভোগ্য হয়।

ঐতিহ্যবাহী সমাজে নেতৃত্বের অভাব

'অস্তিত্ব': বিশ্লেষণ ও সম্পাদনা - ইমদাদুল হক

আর্থসামাজিক মুক্তিতে দর্শনের তত্ত্ব প্রযুক্তি প্রায়োগিক ধর্ম মানুষকে একত্রিত করে। ধীরে ধীরে সেই সমাজ দ্বন্দ্বহীন হয়ে পড়লে সেই দর্শনের অনুসারীরা একত্রিত হয়, কিন্তু তা শক্তিহীন সমাজবোধে। ধর্মের নামে তাদের একত্রিত হওয়াটা আর্থসামাজিক মুক্তির জন্য নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় সৌর জগতের ছান্দিক ঐক্যে পৃথিবীকে স্বর্গ বানানোর জন্য নয়, তা তাদের কথিত মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গ(!) লাভের জন্য। প্রথাপালনে নাস্তিক্য নিয়ন্ত্রণ হয় না, মনের নিয়ন্ত্রণ হয় না, উদবৃত্ত মূল্য বিন্যাসী প্রযুক্তিও প্রয়োগ করতে পারে না। পরোক্ষে তারা শোষকের হয়ে কাজ করে। তাই পুঁজির প্রথম আক্রমণ থাকে দর্শনের তত্ত্বকে তথ্যরূপে বিকৃত করা। অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বাদ দিয়ে ধর্মকে নির্দিষ্ট মডেল করে দেওয়া। সেই সমাজকে দ্বন্দ্বহীন করে সমাজ-মানসকে নানা অপঘটনার পেছনে ছোটানো। দ্বন্দ্বহীন অবচেতনে প্রজন্মের পর প্রজন্ম সেই মডেলে ঢুকে পড়ে। তাই ঋষির সাবধানতা, মানুষ তুমি জেগে থাকো মানে দ্বান্দিক হও, ঘুমিয়ে গেলে তোমার দানবতা তোমারই মানবতার উপর চেপে দাপা দাপি করে। রক্ষ ধর্মকে রাজনীতি বিযুক্ত করে আচার অনুষ্ঠানে ঢুকিয়ে দেয়। যাতে সে ছদ্মবেশে ধর্মের নামে শোষণ চালিয়ে যেতে পারে। সেই সমাজের শান্তিরূপ সীতা ছদ্মবেশেই হরণ হয়ে যায়।

গৌতম বুদ্ধের প্রীত্যর্থীদের প্রতি তাঁর নির্দেশ 'তোমাদের অবাঞ্ছিত যা কিছু সব ছেঁটে ফেল।' সেই নির্দেশে তাঁর প্রীত্যর্থীরা মাথার চুল ছেঁটে ফেললে কি তাদের অবাঞ্ছিত ছাঁটা হয়? না বাৎসরিক কোনো অনুষ্ঠানে জবড়জং ধারণা ধরা মস্তক থেকে তা ছাঁটাই করা মস্তক মুণ্ডন তত্ত্বের প্রয়োগে মাথা ন্যাড়া করলে ধনাবর্জনার সংক্রমণ থেকে মানুষ রেহাই পায়, না তার সংক্রমণী জবড়জং ধারণার বোঝা তার মাথা থেকে নেমে যায়? বুদ্ধের নির্দেশে অবাঞ্ছিত ছেঁটে ফেলতে যারা বাঞ্ছা অবাঞ্ছার তফাৎ করতে পারেনি, তারা অঙ্গ অনঙ্গের তফাৎ করতে না পেরে অষ্ট অনাঙ্গিক মার্গকে অষ্টাঙ্গিক মার্গ আর চার আর্য সত্ত্বকে চার আর্য সত্য করে দিয়েছে।

হজরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর পূর্ববর্তীদের ক্ষমতা দখলের কোনো প্রশ্ন ওঠেনি। ক্ষমতা দখলের প্রসঙ্গ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান বিধান আলকোরান-এর পর। তাঁর নেতৃত্বে এই জ্ঞানের রাজনৈতিক প্রয়োগেই আর্থসমাজ পূর্ণাঙ্গিক জীবন ব্যবস্থা। কিন্তু ঐতিহাসিক ইসলামের চার খলিফার পর স্বঘোষিত খলিফা হয়ে মোয়াবিয়া যে পৈতৃক ক্ষমতার বিষ বীজ পুঁতেছিল, কাল পাত্র ক্ষেত্রিক প্রজ্ঞার অভাবে ইসলামের ঐতিহাসিক অতীত-আরব কেন্দ্রিক চেতনা সেই ক্ষমতা রীতি উপড়ে ফেলতে পারেনি। বরং মোয়াবিয়া থেকে ক্ষমতা পেয়ে ইয়াজিদ কারবালায় নৃশংস ঘটনা ঘটিয়ে পাকাপাকি সেই রীতির ফ্ল্যাগ উত্তোলন করেছিল। যাতে আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রকৌশলী কৃৎকলা শাশ্বত ইসলাম আনুষ্ঠানিকতার ধর্ম(!) রূপে বন্দি হয়ে গেল পৈতৃক ক্ষমতার বিষ বীজ ইন্ধনী অতীতচারিতায়। মানব চেতনা হয়ে গেল রক্ষ ইন্ধনী ধারণাবদ্ধতায় আচ্ছাদিত। যে আচ্ছাদনে সমাজবোধও তাদের শক্তিহীন। কল্যাণের জন্য আহ্বান করেও সেখানে থাকে না তাদের মানব কল্যাণী কোনো কর্মসূচি। অতীতচারিতার হেঁয়ালিতে বর্তমানকে বাস্তবানুগ করতে না পেরে, ইয়াজুজ-মাজুজী জাহেলিয়ানায় অশান্তির পীড়নে সেই আচ্ছাদিতরা পীড়িত হতে থাকল। ইসলামের ঐতিহাসিক আবির্ভাব শুধু অনুষ্ঠান করার অধিকার(!) আদায়ের জন্য নয়, তা আর্থসমাজ-সাংস্কৃতিক রাজনীতির প্রয়োগে সলাত কায়েমের প্রযুক্তিকে আমিত্বের শান্তি ভোগবাচক প্রয়োগ করার জন্য।

ঐতিহাসিক কমিউনিজমের বাস্তবতা কি রক্ষ ইন্ধনী আত্মপ্রতরণায় নাস্তিক আর নাস্তিক্যবাদ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, না অস্বীকার করা যায়? কোন সন্তুষ্টিতে মহাস্রষ্টা কাদের পছন্দ করলেন? সেই ধার্মিক(!) কথিত আস্তিককে না নাস্তিককে? হ্যাঁ এই প্রশ্নটিরই বস্তু জবানিকা হল প্রযৌক্তিক সাহিত্য শিল্পের সাফল্য। যে সাফল্যে মার্কস অভিব্যক্ত অনুভূতির পাঠক লেনিন, হো-চি-মিন প্রমুখের ঐতিহাসিক বস্তু বিজয়। তাঁরা যদি বস্তুবিচ্ছিন্ন আত্মপাণ্ডিত্যের ডেঁপোমিতে মার্কসকে নির্বাসন দিতেন, অথবা কূপমণ্ডূকী আগ্রাসনে সারাজীবন ধরে মার্কসের গুণগান করতেন, দ্যস ক্যাপিটালের খতম বক্সাতেন, তবে কি তা বস্তু গ্রাহ্য হত, না সেই ঐতিহাসিক সাফল্য অর্জন করা যেত? আর তারপর রুশ বিপ্লবের ইতিহাস তো এখন রক্ষ প্রভুদেরও জানা!

‘প্রতি’ অর্থে ন্যায়, তুলনীয়, সদৃশ আর ‘মা’ অর্থে তত্ত্ব, জ্ঞান, শক্তি। মানুষেরই রক্ষণকামিতা দর্শন-তত্ত্বকে তথ্য করা প্রতিমা (নির্দিষ্ট মডেল) খাড়া করে। প্রতিমা দুই ধরনের ¾ আকার প্রতিমা আর আচার প্রতিমা। প্রতিমা খাড়া করা মানেই সেই সমাজে দর্শন-তত্ত্ব প্রযুক্তি প্রয়োগ না হওয়া। সাহিত্য, মনোবিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাস এই ছয়টি বিষয়ে পারদর্শিতা না থাকলে, প্রযোক্তা দর্শনের অখণ্ড-তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, আর্থসমাজ জীবনে তা প্রয়োগ করতেও পারে না। শুধু তা মুখস্থ করে আবৃত্তি করে। যা দর্শন-তত্ত্বকে গিলে খাওয়া। আর গিলে খেলে কী হয় তা প্রকৃতির দিকে তাকালেই বোধগম্য। গিলে খাওয়া জন্তুরা হয় হিংস্র। তেমনি ধর্মের নামে দর্শন-তত্ত্ব গিলে খাওয়া প্রথাপালনীরাও হয় হিংস্র। ট্র্যাডিশনে চলতে থাকে আড়ম্বরী আনুষ্ঠানিকতা। নির্দিষ্ট মডেলে ঢুকে যায়, তৈরি হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম(!), যা সেন্টিমেন্ট ছাড়া কিছুই নয়। অবাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টের গণ্ডিবদ্ধতায় জিন উসকে তারা হয়ে যায় হঠকারি, আত্মঘাতী। এই সেন্টিমেন্ট রাজনীতিতে ব্যবহৃত হলে তা হয় দাঙ্গাহাঙ্গামায় অপরাজনীতির ক্ষমতা কব্জা করার বিধ্বংসী বিভাজনী লড়াই। বিভাজনে বাড়তে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম(!)। রক্ষ লড়াই লাগিয়ে দেয় ধর্মীয় এক সেন্টিমেন্টের সাথে অন্য সেন্টিমেন্টের, তৈরি করে জাতপাত, রেসিয়াল, ...। সমাজকে টুকরো টুকরো করে দেয় যাতে তারা ধর্মের পথে একত্রিত হতে না পারে, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হতে না পারে। তাই সে প্রচার করে ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। ধারণাবদ্ধতায় আচ্ছাদিত ধৃতরাষ্ট্রিক অন্ধত্বে পরকালকে ধরে নেয় মৃত্যু পরবর্তী কাল। মৃত্যু পরবর্তী স্বর্গ(!) লাভের মোহে আনুষ্ঠানিকতা করে। লক্ষ্যবাচক দিশা দেখতে না পেয়ে অতিন্দ্রীয়তায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে হেঁয়ালি করে।

চেতনা বর্তমানে না থাকলে, পাঁচ জন একসাথে বসে কথা বললে আলোচনার বিষয়বস্তু থাকে অতীত নিয়ে। বর্তমানের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে না, লক্ষ্যবাচক কোনো সমস্যার সমাধানও হয় না। সমস্যায় জর্জরিত হয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে ছোটাছুটি করে। নিজের প্রতি বিশ্বাস মানে ইমান থাকে না, মানবিক শক্তি কমে যায়। তাদের উপলব্ধি করার ক্ষমতা মানে ঐশ্বরিক শক্তি তাদের নাগালের বাইরে মানে উপরে আকাশে চলে যায়। তাই তারা সবকিছু উপরওয়ালার উপর ছেড়ে দেয়। কেন না, তারা মানুষ তথা আর্থসমাজ, উৎপাদনী শ্রম, উৎপাদনের মূল্য নির্ধারণ, মূল্য নিয়ন্ত্রণ, মূল্যের বিভাজন, জ্ঞান, সামাজিক বিকাশ এসবের মধ্যে স্রষ্টাকে ভাবতে পারে না। তাদের ধারণা শুধু প্রার্থনা করে স্রষ্টার কথা ভাবতে হয়, ধার্মিক(!) হতে হয়। চেতনা বর্তমানে না থাকায় তারা বাস্তবতায় থাকে না, যুক্তি নির্ভর হতে পারে না। ধারণাবদ্ধতায় সমাজকে দ্বন্দ্বহীন করে আনুষ্ঠানিকতা বাড়িয়ে দিতে পুঁজি লগ্নি করে। যেমন বিংশের ষাটের দশকে রক্ষ রুশ জনপদে রাতের অন্ধকারে রঙিন চাকতি উড়িয়ে প্রচার করত এসব উপরওয়ালার লীলাখেলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে লেনিনের মূর্তি তৈরি করে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় তার প্রতিনিধিকে দিয়ে মূর্তিতে ফুল দেওয়া প্রথাপালন সংক্রমণ করাত আর সে প্রচার করত তাতে পরীক্ষার ফল ভালো হবে।

মানুষকে একবার ধারণাবদ্ধ করে দিতে পারলেই

পুঁজির কেল্লাফতে। প্রথাপালনে একবার ঢুকে গেলে সেখান থেকে সহজে বেরিয়ে আসতে পারে না। প্রথাপালনের নেতৃত্বে যিনি থাকেন তার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, তিনি কী বলছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রিধারীরাও তার নির্দেশে আনুষ্ঠানিকতা করে। কেউই দর্শন-তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করে না, তা নিয়ে ভাবে না, গবেষণা করে না, আর্থসমাজে তা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে না, সহজ সরল পথ নির্মাণ করতেও পারে না। দর্শন-তত্ত্ব না পড়ে, না বুঝে শুধু ধারণাবদ্ধদের কাছে শুনে শুনে তারা তাতে সংক্রামিত হয়। উন্নত চেতনাকে প্রথাপালনে সংক্রামিত করে, না হলে বাধ্য করে। প্রথাপালনে, নিয়ম শৃঙ্খলা নীতি-আদর্শ উপেক্ষিত হয়। কোনো দিশারী দর্শন-তত্ত্ব বোঝালেও তারা তা জানতে বুঝতে চায় না, উল্টে গান্ধারীর ঠুলি পরা অন্ধত্বে তারা সেই দিশারীকেই আক্রমণ করে, অভিশাপ দেয়। প্রশ্ন না জাগাই তাদের চেতনার কর্ষণ হয় না, মেধা অন্তর্লীন হয়ে যায়। প্রথাপালনে আমিত্বের বিবর্তন হয় না, চেতনার বিকাশ হয় না, উপলব্ধি মানে ঐশ্বরিক শক্তি অনুভব করতে পারে না, সমস্যার সমাধান করতে পারে না, শান্তিভোগ থাকে না।

যে কোনো পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়িত করতে ভাবতে হয়। চিন্তা ভাবনা ছাড়া উপলব্ধি করার ক্ষমতা বাড়ে না, কোনো কিছুরই বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। অথচ যে দর্শনে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার উল্লেখ, সেই দর্শনকে দ্বন্দ্বহীনরা ভাববাদী দর্শন বলে উড়িয়ে দেয়। অনুভূতির অনুবাদ করতে না পেরে রক্ষ বস্তুকে পদার্থে গুলিয়ে দিয়ে গিলিয়ে দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে পুনর্স্মর্তব্য যে, বস্তুভোগে উপজাত হিসেবে তৈরি হয় পদার্থ। আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তি না জেনে, যারা ধর্মস্থানে(!) গিয়ে প্রথাপালন করে নিজেদেরকে ধার্মিক(!) বা আস্তিক(!) বলে, অন্যদিকে সেই প্রথাপালনকে ধর্মের স্বীকৃতি দিয়ে অন্যরা নিজেদেরকে নাস্তিক(!) বলে। ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সেন্টিমেন্টের প্রথাপালনী আনুষ্ঠানিকতাকে কার্ল মার্কস নেশার সাথে তুলনা করেছেন। কেন না, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করা থেকে সমাজ পাঁকে আটকে যাওয়া মানে গাঁজার কলকি ধরে নেওয়া অত্যন্ত সহজ। আর এই জন্যই রক্ষ অন্যান্য দর্শনকে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের(!) মোড়কে নির্দিষ্ট মডেল (প্রতিমা) করে দিলেও মার্কসিয় দর্শনকে তা করতে পারেনি। তবে রক্ষ এর বিপরীতে যে সংক্রমণটা করেছে তা হল, আত্মার কথা শুনে আঁতকে ওঠা আর ধর্মাতঙ্ক তৈরি করা। সেই আতঙ্কে তারা মানব দেহমনের পরিচালক 'আমিত্ব'-কেই নির্বাসন দেয়, বস্তুর বর্তন প্রাসঙ্গিক মনের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। পাঁকে আটকানো সেন্টিমেন্ট বিশেষিত সমাজে দ্বন্দ্ব থাকে না। যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, সেখানে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণী রাজনীতি নেই মানে ধর্ম নেই। সেই প্রথাপালনী সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্বের অভাব। রাজনীতিহীনতার কারণে যোগ্যতম নেতৃত্ব তৈরি না হওয়ায় কোথাও জনগোষ্ঠী বা কোথাও জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়। যেমন আরব জনপদগুলোয় রাজনীতি নির্বাসন দিয়ে পৈত্রিক ক্ষমতা রীতিতে শাসন চালায় বলে সেই জনপদগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।

সবুজ বিল্পব থেকে অতি সবুজ বিল্পব

অনুপম পাল

আগের সংখ্যার অনুবৃত্তি

ভারতীয় জৈব সম্পদ

ফসল	সংখ্যা	মন্তব্য
ধান	৮২৭০০ (ভারতে)	
	৫৫০০ (পশ্চিমবঙ্গে)	পৃথিবীর খুব কম দেশে এই বিপুল জৈব সম্পদের অধিকারী। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ৯০ শতাংশের বেশি জৈব সম্পদ কৃষকের মাঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আবার দিল্লির জিন ব্যাঙ্কের কত সংখ্যক জীবিত আছে তা অজানা। উল্লেখ্য, এই জৈব সম্পদের কোনো মূল্যায়ন হয়নি। ফলন, অন্যান্য পুষ্টি ঔষুধি গুণ নিয়ে এখনো পর্যন্ত মূল্যায়ন হয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রামাণ্য প্রকাশনা নেই।
গম	৩৮০০০	
ভুট্টা	৭২৬১	
জোয়ার	১৮৮৩৪	
ছোলা	১৬৪২৭	
মুসুর	৭৭১২	
অড়হর	১০৯৮৮	
মুগ	৩৫৫৯	
বাদাম	১৩৪৪৯	
সরিষা	৯৩২২	
তুলো	৪৮৩২	সূত্র: ন্যাশনাল ব্যুরো অব প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স এর বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৭-০৮, নতুন দিল্লি।
নটে	৪৯৩২	
বেগুন	৩৮৬৮	
পাট	২৮৬৪	
ধনে	৪৮৫	
আম	১০০০	
গরু	৬১	
ভেড়া	২৬	

পরিতাপের বিষয় এই সমস্ত ফসলের ৯০শতাংশ এর বেশি কৃষকের জমি থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পৃথিবী থেকে অমূল্য জৈব সম্পদ নিশ্চিহ্ন হওয়া নিয়ে রাজনৈতিক দল ও নীতি নির্ধারকরা এখনো মৌনতা অবলম্বন করেছেন। তাছাড়া ভোট রাজনীতিরও বিষয় হতে পারেনি। বিপুল ফসল ও প্রাণী সম্পদের কোন মূল্যায়ন ছাড়াই আরো নতুন ফসলের জাত উদ্ভাবন হয়। সেই ফসলে অবশ্যই রাসায়নিক সার ও কীটনাশক লাগবে : বীজটাও বাজার থেকে কিনতে হবে। কৃষকারাও নতুন ফসলের জাত চান কারন তারা দেখছেন একই জাতের ফসল কয়েক বছর পর ভালো ফলন দিচ্ছে না। তাঁরা গিয়েছেন দেশজ ফসল হাজার বছর পরেও একই ফলন দেয়। আধুনিক ও শংকর জাতের ধানের বীজ যেমন চালু করানো হয়েছে তেমনি

ভুট্টার ও বিভিন্ন সবজির শংকর জাতের বীজ বাজারে ছেয়ে গেছে। নতুন একটি জাত (ধরা যাক বেগুন) বাজারে বিক্রির জন্য ছাড়ার সময় কখনো বলা হয় না যে ভারতের ৩৬৮৬ রকম বেগুনের মধ্যে 'এই' ধরনের বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জাতটি ছিল না। এটা অন্য ফসলের নতুন জাতের বাজারজাত করণের সময়ে দাবী করা হয়। সবজির মধ্যে বেগুন বহুল প্রচলিত একটি সবজি। এখনো কিছু ভাল জাতের দেশি বেগুন টিকে আছে। যেমন বেনারসের এক কেজি ওজনের সাদাটে গোল বেগুন যা কাশীর বেগুন বলে পরিচিত, উত্তর দিনাজপুরের বিগোরের ৬০০- ৭০০ গ্রাম ওজনের হালকা সবুজ বেগুন, মালদার লম্বাটে সবুজ বেগুন, নদীয়া ও ২৪ পরগনার বড় জাতের মাকড়া বেগুন। রোগ পোকা কম লাগে আবার সব জায়গায় ভালো হয়ও না। এখনকার শংকর জাতের বেগুনে প্রচুর রোগ পোকা লাগে, প্রচুর কীটনাশক ও স্প্রে করতে হয়, বেগুন হয় বিষময়। শুধু বেগুন কেন ধান, ডাল ও অন্যান্য শাক সবজিরও ফলন ভালো ছিল, রোগ-পোকাও কম লাগত। এখন প্রচুর রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও শংকর (হাইব্রিড) বীজ ব্যবহার করেও আগের থেকে চাষের খরচও বেড়েছে সেই সঙ্গে পোকা মাকড়ের সংখ্যাও বাড়ছে। এই ব্যবস্থা কি চলতে থাকবেই? বিষযুক্ত খাবার খেয়ে মানুষের চিকিৎসা ব্যয়ও বেড়েছে। অন্যদিকে দেশজ ফসলের পুষ্টি গুন বেশি।

প্রতিকূল আবহাওয়া সহ্যকারী গুজরাটের গরু গির। রেড সিন্ধি, সাহিওয়াল, থারপারকার, ওঙ্গল ও রাঠি জাতের গরুর কথাও মানুষ ভুলতে বসেছে। গির জাতের গরুও কম দুধ দেয় না, পোষার খরচ কম। আমরা খবর রাখিনা ব্রেজিলের প্রথম শ্রেণির গরু হল ভারতীয় গরু গির। যেকোনো গরু বা মোষের জাতের মান উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিশেষ নির্বাচিত প্রজনন। মোষের মুর্রা জাত ছাড়া ভারতে খুব একটা কাজ হয় নি। দেশের গরুর কোন মূল্যায়ন করে বরং অবহেলা করে শুধু মাত্র দুধের জন্য বিদেশি হলস্টিন ফ্রেসিয়ান ও জার্সি গরুর দুধ এখন ভরসা। ইংরেজের নথিতে আছে ভারতীয় আবহাওয়ায় ভারতীয় মূলত গরুর নির্বাচিত প্রজনন দরকার। বিদেশি গরু নয়। আগে গ্রামে এমনকি শহরতলিতেও গরু পালনের চল ছিল। গ্রামের গরু চরে খাওয়ার ফলে দৈনিক প্রায় ২০-২২ রকমের গাছপালা / উদ্ভিদ তালিকায় যুক্ত হত। দুধেও সেই ভেষজ গুন থাকত। খাটালের গরুর দুধে এই গুন থাকার কথা নয়। এখন তো শুধুই প্যাকেটের দুধ। আবার প্যাকেটের দুধ বা খাটালের দুধ খেয়ে নানা পেটের সমস্যা হচ্ছে। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে এই সমস্যা হয়ত ছিল ; কিন্তু খুবই সামান্য। আসলে এখনকার দুধ সবই হলস্ট্রিন ফ্রেসিয়ান ও জার্সি গরুর শংকরায়িত গরুর দুধ। এই দুধে রয়েছে প্রোটিন বিটা কেসিন এ ১ রুপ (বিটা কাসো মারফিন ৭) । বুয়া হচ্ছে এর থেকে মানুষের উচ্চ রক্ত চাপ, মধুমেহ, দুধ সহ্য না হওয়া সমস্যার মত রোগ বাড়ছে। অন্যদিকে দেশি গরুর দুধে বিটা কেসিন এ ২ রুপ থাকার জন্য এই সমস্যা বিরল। তাছাড়া প্যাকেটের দুধে ভেজাল ধরা পড়ছে। বেশি দুধ পাওয়ার জন্য অনৈতিক ভাবে গরু মোষকে অক্সিটোসিন হরমোন দেওয়া হচ্ছে।

ধান :

ধান ছাড়া কৃষি আলোচনা হতে পারে না। বিশেষত বাংলায়। কোটি কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য। ভূমি ও পরিবেশগত কারনে ভারতের পূর্বদিকে বসবাসকারী মানুষের প্রধান খাদ্য ভাত। জলাজমিতে ধানের সঙ্গে সহজেই মাছ, গেড়ি গুগলি জন্মাতো। পূর্ব ভারতের অবিভক্ত বাংলায় প্রচুর নদী নালা, খালবিলেও মাছ স্বাভাবিক ভাবেই জন্মাতো। রাসায়নিক সার ও বিষ ব্যবহারের ফলে ধান খেতে আর মাছ জন্মায়, না হারিয়ে গিয়েছে বহু ধরনের ধান খেতে হওয়া মাছ। ফসল চক্রের নিয়ম অনুসারে ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে জমিতে খেসারির বীজ ছড়িয়ে দেওয়া হত। কোন চাষের প্রয়োজন হত না, কোন পরিচর্যারও বিশেষ দরকার হত না। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন আবদ্ধকারী নীলাভ সবুজ শ্যাওলা ও শিকড়ে অর্বুদ যুক্ত শোলাগাছ জলমগ্ন ধানের জমিতে জন্মাতো।

জাত বৈচিত্র্য :

১৯৩০ সালের এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে অবিভক্ত বাংলায় প্রায় ১৫০০০ জাতের ধান ছিল। পশ্চিমবাঙ্গলায় অঞ্চল ভিত্তিক মোট ধানের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৫০০। সেই সব ধান কৃষকের জমি থেকে চিহ্নিত। প্রত্যেকটা জাত ছিল অনন্য, বিশেষ গুন সম্পন্ন। খরা, বন্যা, লবন ও গভীর জল সহনশীল, প্রথমে খরা ও পরে বন্যা সহনশীল (বিহারের কোশী নদীর উপকূলে হওয়া গামরাহ্‌) গভীর জলের বোরো ধান, সরু চাল সুগন্ধি চাল, খই, মুড়ি ও ফ্যান ভাতের চাল ইত্যাদি আমাদের কাছে অতীত হয়ে যাচ্ছে। শুধুমাত্র গোবর সার দিয়েই কিছু দেশি ধানের ফলন বিঘা প্রতি হয় ১৫- ১৯ মন। কেরালা সুন্দরী (পুরুলিয়ার নির্বাচন করা ধান), বহুরূপী, কেশবলাল, বউরানী, বলরামশাল, অগ্নিবান, বাঁশপাতার মত এখনো কিছু জাত টিকে আছে। এগুলো বাজারে বিক্রি হয় না। কৃষকেরা নিজেদের মধ্যে আদান প্রদান করেন। ফলন বছরের পর বছর ঠিক থাকে। আধুনিক জাতের মত নয়। রাসায়নিক কৃষির মূল স্রোতে এই সব ব্রাত্য। এর সাথে বাজারের কোনো উপকরণের প্রয়োজন নেই।

মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবসায়ীর কোন লাভ হবে না। ইংরেজ আমলে তামিলনাড়ুর সালেম ও থাঞ্জাভুর জেলায় দেশি আঞ্চলিক ধানের ফলনের রেকর্ড রয়েছে ৩৩ শতকের বিঘায় ২৫-৩০ মন। ১৯৫২ সালের ভারত সরকারের ও ১৯৭১ এর মধ্য প্রদেশ কৃষি দপ্তরের অনুরূপ তথ্য রয়েছে। অথচ বলা হল দেশি ধানের ফলন কম। এখন মেরেকেটে কৃষকের জমিতে ১৫০ রকমের দেশি ধান পাওয়া যেতে পারে।

দেশি ধানগুলি বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে। পরিবেশ বান্ধব এই চাষের খরচ কম, বিষ সারও লাগেনা। এই ধান গুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ, গোটা পৃথিবীর জৈব সম্পদ। এই ধানের মধ্যে আছে রোগ পোকা প্রতিরোধ ও বেশি ফলনের ক্ষমতা। কোন জাত উদ্ভাবন করতে হলে বা প্রাকৃতিক দূর্যোগে আধুনিক ফসলের জাত হারিয়ে গেলে এই দেশি জাতের প্রয়োজন পড়বে। অবশ্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে দেশি ধানও হারিয়ে যেতে পারে। সেটা হয়তো কোন একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল হতে পারে। চাষ না হলে কোন দেশি ধান বেঁচে থাকবে না। কে বাঁচিয়ে রাখবে? কার দায়। সেই দায়িত্ব পালিত হচ্ছে কি? হারিয়ে যাওয়া ধানের কিছু নমুনা হয়ত মিউজিয়ামে রাজা বাদশার ব্যবহার্য দ্রব্যের মত শোভা পাবে। চাঁদে, শুক্রে ও মঙ্গলে মহাকাশ যান পাঠানো যেতে পারে, কৃত্রিম হার্ট প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু কেউ হারানো ফসলের জাতকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। ফসল বৈচিত্র্যই ভবিষ্যৎ খাদ্য সুরক্ষার সহায়ক। এই সত্যটা আমরা বুঝতে পারছি না। কল্পবিজ্ঞানের জুরাসিক পার্ক চলচিত্রে ডিম থেকে ডাইনোসর তৈরি করা যায়, বাস্তবে নয়।

আমাদের ঐতিহ্য :

আমাদের পূর্বপুরুষরা ওই সব দেশি ধান গুলি নির্বাচন করেছিলেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে। সেই সব নাম জানা কৃষকরা জিন, প্রোটিন, বিজ্ঞান, জটিল পরিসংখ্যান ইত্যাদি না জানলেও সযত্নে ওই জাতগুলির লালন পালন করেছিলেন। আমরা তাঁদের সম্মান কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলে যাই। বহু বছর আগে থেকেই ভারত থেকে বাসমতি চাল বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। আবার বার্মা থেকে ভারতে প্রচুর চাল আমদানি করা হত। ইংরেজ আমলে বাংলা থেকে চাল মধ্য প্রাচ্য, ইউরোপ,আফ্রিকার কিছু দেশে বাংলার পাটনাই, কলমা, ঝিঙেশাল, নাগরা, বালাম, ইত্যাদি চাল রপ্তানি করা হত। বরিশালের ঝালকাঠি থেকে সুস্বাদু বালাম চাল বজরায় কলকাতায় আসত। অনেক ধরনের বালাম চাল ছিল। ১৯৩০ সালে সরু চালের মন ছিল দেড় টাকা। দক্ষিনপূর্ব এশিয়ায় ভারত থেকে ডাল ও তৈল বীজ রপ্তানি করা হত। এখন অবশ্য ডাল ও তেল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। সবুজ বিপ্লবের পর থেকেই দেশি ধানের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। তথাকথিত উচ্চফলনশীল ধানের শুধু দানার ওজনটা বেশি এই প্রচার চালানো হয়। স্বাদ বৈচিত্র্য, খড় ও মাছের হিসাব বাদ হয়ে গেল। ফলন বেড়েছিল

ঠিকই কিন্তু এর পেছনে কত ব্যয় হল, পরিবেশের উপর বিপুল ক্ষতির পরিমান উহ্য রাখা হল। মোট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচের প্রসার ও অকৃষি জমিতে রূপান্তর হওয়ার বড় কারণ। পরিবেশ ঠিক রাখার বিষয়টা চাষবাসের থেকে আলাদা রাখার চেষ্টা না করলে রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বীজ, মাটির তলার জল তোলার পাম্প সেট বিক্রি ধাক্কা খাবে। রাসায়নিক কৃষির প্রবক্তা ও কোম্পানির কাছে এটাই সুবিধা যতদিন চেপে যাওয়া যায় ততদিন মুনাফা বেড়ে চলে। প্রাকৃতিক সম্পদকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করে ও দেশজ প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সাহায্যেই ভালভাবেই যে ফসল উৎপাদন করা যায় এ উদাহরণ সারা পৃথিবীতে বহু জায়গায় হাজার হাজার বছর ধরে পরিক্ষিত ও প্রমানিত।

দেশি ধান ও খাদ্য সুরক্ষা :

২০০৯ এর ২৫ এ মে সুন্দরবন অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে গেল বিধ্বংসী সমদ্র ঝড় আয়লা। তারপর ঐ অঞ্চলের মানুষের বেচে থাকাটাই দুর্বিষহ ছিল, চাষবাস তো দুরের কথা। অসংখ্য গবাদি পশুর মৃত্যু হয়ে ছিল। গরু, বাছুর, ছাগোল, ভেড়ার খাবার কিছু ছিল না। জমিতে লবন জল ঢুকে পড়ার ফলে কোন প্রকার চাষাবাদ অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। ওই সমুদ্র উপকূলবর্তী নদি বহুল অচঞ্চলের জোয়ারভাটা খেলে, বর্ষায় অনেক জায়গা প্লাবিত হত। বস্তি বাড়ার সাথে সাথে বড় বড় বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ল। লবন জলের প্রবেশ আটকানো গেলে। লবন সহনশীল ফসলের বদলে অন্যান্য ফসল চাষের প্রবণতা বাড়ল। লবন সহনশীল ধান ও চাষির মাঠ থেকে হারিয়ে গেল। সোনার পাথর বাটি সদৃশ তথাকথিত লবন সহনশীল উচ্চফলনশীল ধানের চাষ বাড়ল। ভুলটা ভাঙলো আয়লার পর। অপেক্ষাকৃত কম লবন যুক্ত জমিতে আধুনিক জাতের ধান কিছুদিন পরেই মারা গেল। দেশি ধান কিছু জায়গায় টিকে গেল। যোগেশগঞ্জ এলাকায় ওই কথারই অনুরণন করলেন বিষ্ণুপদ মৃধা, প্রকাশ মন্ডল, প্রভাস মন্ডল প্রমুখ কৃষকরা। পরের বছর জমির লবন পুরোপুরি বৃষ্টিতে ধুয়ে প্রশম হয়ে যায় নি। ২০১০ সালে ওই ধরনের লবণ সহনশীল দেশি ধানের চাহিদা বাড়তে লাগলো। কুটে পাটনাই, তালমুগুর, লালগেতু, সাদা গেতু, হোগলা ও হামাই ইত্যাদি ধরনের খোঁজ শুরু হলো আবার। অন্যদিকে লবণ সহনশীল মাতলা ও হ্যামিলটন (হ্যামিলটন সাহেবের নামে) ধান চাষির মাঠে আর পাওয়া যায় না। ওই ধানের ফলন কম হলেও জমিতে চিংড়ি মাছ ও অন্যান্য মাছ পাওয়া যায়। মাছের সঙ্গে খড়টাও অতিরিক্ত লাভ। ওই ধরনের লবণ জল যুক্ত জমিতে কোন উচ্চফলনশীল ধান (আধুনিক জাত) চাষই সম্ভব নয়, সুতরাং ফলন কম বলাটা যুক্তিযুক্ত নয়। ওই অঞ্চলে সহজেই জল দাড়িয়ে যায়। ১০ - ১২ দিন জলে ডুবে থাকতে পারে এমন ধান, জল বাড়বে ধান বাড়বে - এমন ধানের দরকার। শুয়ে পড়া অবস্থায় ধান বেড়ে চলে ও পরে জলের উপরে শীষ মাথা তুলে থাকে যাকে বলা হয় হেটো-কেনো। খড় অনেক লম্বা হয় - ১০-১২ ফুট তো হয়ই, জলের ভিতরে গাট থেকে পাশকাঠি বের হয় অর্থাৎ পরিবেশের সঙ্গে ঠিকঠাক মানিয়ে নিতে পারে। এই ক্ষমতা কোন আধুনিক জাতের ধানে নেই। উন্নয়ন মানসিকতায় শুধুমাত্র ধানের দানার ওজন বেশি হবে এটাই দেখা হয়েছিল। কৃষি বাস্তুতন্ত্র এবং খেতের মোট উৎপাদনশীলতার কথা ভাবা হয় নি। কৃষককেও সেটাই ভাবতে শেখানো হয়েছে।

আয়লার পর নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীদের মতামত সঠিক প্রমাণ হল। প্রান্তিক জমিতে একমাত্র দেশি ধানই ভরসা। কোন প্রাক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে চালু আধুনিক ধান নষ্ট হয়ে গেলে পুরোপুরি ভাবে খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আয়লার পর ওই অঞ্চলের কৃষকরা নিজেরা এই তফাতটা ধরতে পেরেছেন কৃষকদের মধ্যে তাই দেশি ধান চাষের আগ্রহ বেড়েছে। প্রায় পঞ্চাশ ভাগ জমি এখন দেশি ধানের আওতায়।

দেশি বনাম উচ্চফলনশীল :

উল্লেখ্য দেশি ধানের একবার বীজ সংগ্রহ করলে এবং বীজ সংগ্রহ পদ্ধতি ঠিক থাকলে হাজার বছর চাষ করা যায়, ফলনের বিশেষ হেরফের হয় না। অন্য দিকে উচ্চ

ফলনশীল ধান সর্বত্র উচ্চফলনশীল নয়। সমতল ও প্রশম জমিতে নতুন বীজ, সার ও কীটনাশক সহযোগে চাষ করতে হবে। প্রথম কয়েক বছর ভাল ফলন হবে ; পরে ফলন কমবে বেশি সার ব্যবহার করেও। তাছাড়া ওই ধরনের বীজ প্রান্তিক জমি যেমন— লবনাক্ত জমি, বন্যা ও খরা প্রবন জমিতে হবে না। হাইব্রিডের ক্ষেত্রে দামি বীজ প্রত্যেক বছর কিনতে হবে আর উচ্চ ফলন ধানের ক্ষেত্রে ৩ বার চাষ করার পর বীজ কিনতে হবে। কৃষকদের বীজের উপর নির্ভরশীল করে দেওয়া হল।

আধুনিক জাতের ধান ২-৩ বার চাষ করার পর নতুন শংসিত বীজ কিনতে হবে নতুবা ফলন কমবে। আসলে ওই জাত গুলি প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয় নি এবং বীজ প্রকৃতির কোলে দীর্ঘ বছর ধরে পরিক্ষিত নয়। যে জাত দুটি / তিনটি জাতের মধ্যে পারস্পারিক মিলনে তৈরি করা হয়েছে সেই মূল পিতা—মাতার চরিত্র প্রকট হয়ে পড়ে। ফলে ধান খেতে নানা ধরনের ছোটবড় ধান দেখা যায়। ধানের আকার পালটে যায়, সরু চাল মোটা হয়ে যায়, পাকার সময়ে অনেক ফেরফের হয়, ফলন কমে যায়। তাই আবার নতুন বীজ কেনার প্রয়োজন পড়ে।

ফলন বৈচিত্র্য :

দেশি ধান মানেই ফলন কম নয়। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফুলিয়ায় ১৫ দিনের ধানের চারা এক কালি করে লাগিয়ে এবং জৈব সারে নিম্ন লিখিত ফলন পাওয়া গেছে। কৃষকের জমিতেও ওই রকম ফলন হচ্ছে। সব দেশি ধান শুয়ে পড়ে না এবং অল্প দিনে পাকবে এমন ধানও আছে। আছে ঔষধি গুন সম্পন্ন ধান। বেশি ফলনের কয়েক রকম ধান হল পুরুলিয়ার নির্বাচিত ধান - কেরালা সুন্দরী, বহুরূপী, রাবন শাল, অগ্নিবান, আশফল ইত্যাদি। বিঘায় ২০ মন ফলন দেওয়ার ক্ষমতা আছে। বেশি সার ও বিষ দিয়ে আধুনিক জাতের ধান লাল স্বর্ণ জাতের ফলন বিঘায় ২০ মন থেকে নেমেছে ১৪ মনে। কৃষককে এই দেশি ধানের সম্ভার মেলে ধরলে তাঁরাই ঠিক করবেন কোন জাতটির চাষ করবেন। কিন্তু এই তুলে ধরার বিষটি হয় নি। সুগন্ধি শানের ফলন সাধারণত কম হয়, জাত অনুযায়ী ৭-১২ মন বিঘায়। মধ্যপ্রদেশের সুগন্ধি লাল চালের ধান আদানছিলপা ও উড়িষ্যার মল্লিফুলোর ফলন চোখে মত ; বিঘায় প্রায় ১৪ মন। ওই রকম অপার বৈচিত্র্য এখনও আমাদের অজানা।

আশার কথা :

ভারতে ২০০২ সালে তৈরি হয়েছে জীব বৈচিত্র্য আইন। দেশের ফসল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হল। ইতিমধ্যে বিপুল ফসল বৈচিত্র্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। দেশজ ফসল সম্পদকে সুরক্ষা দেওয়ার সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জের সৌজন্যে ২০১১ - ২০২০ এই দশককে আর্ন্তজাতিক জৈব বৈচিত্র্য দশক হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতে বিভিন্ন সংগঠন ফসল বৈচিত্র্য সংরক্ষণ নিয়ে কাজ করছেন। কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ফুলিয়ার খামারটিকে ২০০৬ সালে জৈব বৈচিত্র্য খামার বলে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ও রাজ্য কৃষি বিভাগ সহযোগিতায় কৃষি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-ফুলিয়া রাজ্যের ১৫ টি জেলায় ১৫ টি ব্লকে দেশি ধান নিয়ে কাজ শুরু করেছে। কৃষকদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্যের ২০ টির বেশি খামারে দেশি ধান চাষ হচ্ছে। এটিসি ফুলিয়ার সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ২৬ টি দেশি ধানের বীজ বিনিময় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। নদীয়ার হাঁসখালিতে অবস্থিত মহকুমা কৃষি খামারে ১৮ বিঘা জমিতে ৮ টি দেশিয় ধান চাষ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরস্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনায় ১৩ টি জেলায় জৈব কৃষির জন্য প্রায় ৬০০০ একর জমিতে ১২০ গোষ্ঠী নির্বাচন করা হচ্ছে।

‘প্যারালাইজড সোসাইটি’র উদবর্তন

কিংশুক সন্ন্যাসী

আমাদের দেহের কোনো একটি অঙ্গ কিংবা পুরা দেহটাই প্যারালাইজড হয়ে গেলে কী হয়? না, আমাদের সেই অঙ্গটি বা পুরো দেহটিই অসাড় হয়ে পড়ে। চেতনা-অনুভূতি থাকে না। কোনো কিছুতেই সাড়া পাওয়া যায় না বা কাজ করে না। অর্থাৎ সেনসিটিভিটির ক্ষমতা হারিয়ে যায়। তখন আমরা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে ডাক্তারি পরামর্শক্রমে পুনরায় সেনসিটিভ করার প্রয়াস নিই। মানব দেহের এই প্যারালিসিস অবস্থার থেকে কাম ব্যাক করাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেই ব্যক্তিকে ঐ অসাড় যন্ত্রণা নিয়েই দিন গুণতে হয়। কখনো কখনো কিছু ক্ষেত্রে এই অবস্থা কিউর হয়ে স্বাভাবিক জীবন ছন্দে ফিরে আসে।

উপরে উল্লিখিত বিষয়টি আর্থসমাজের ক্ষেত্রেও হয়ে থাকে। বর্তমান আর্থসমাজ কাঠামোর বেশির ভাগটাই প্যারালাইজড হয়ে পড়েছে। যার পরিণামে আমাদের আর্থসমাজে তার বিকৃতির সংক্রমণ ঘটছে। যা পৈশাচিক, অমানবিক ইত্যাদি। সামান্যতম মানবিক সেন্স কাজ করলে এইরূপ ঘটনার সংক্রমণ ঘটে না। এইরূপ অনুভূতিহীন অপকর্মের নমুনা আমরা অহরহই লক্ষ্য করছি। এর মধ্যে কিছু উলেখ্য –

১। মাত্র ২ থেকে ৫ বছরের শিশু, তারাও আজকে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার। ভারতের কাঠুয়া থেকে দিল্লি, আলিগড়, মন্দাসৌর, বিহারের আশ্রম প্রভৃতি স্থানের সাম্প্রতিকতম অপকাণ্ড। কারা ঘটাল, এই অপঘটনা? আমার আপনার মত দেখতে মানুষরূপী পশুরা। তারা এই সমাজেই বসবাস করে, খায়, চলাফেরা করে। আমার আপনার সাথে ওঠাবসা করে। এই সমস্ত অপকাণ্ড কি সুস্থ সমাজ তথা ব্যক্তি মানসের লক্ষণ? এটা সমাজের কোন অবস্থা? সচেতন না অচেতন? এদের কোন বিকৃত মানস এই সব অপঘটনা ঘটায়?

২। মুনাফাখোরি এমন চরম যে, নারী ও শিশুদের পাচার করছি। তাদের বেশ্যালয়, হোটেলে, বিভিন্ন স্থানে দাসত্বের নরকে নিক্ষেপ করছি। টাকার জন্য। মুনাফার লোভে। সুস্থ স্বাভাবিক শ্রম এড়িয়ে বিনাশ্রমে আরো বেশি টাকা পাওয়ার ব্যক্তি মানসের বিকৃতিতে। নারী যেখানে পণ্য। অন্য সব পণ্যের মত তাদেরকেও আজ আমরা কেনাবেচা করছি। এটা কি আমাদের অর্থাৎ সমাজের অনুভূতিতে কোনো দাগ কাটছে? তাহলে কেন কাটছে না? এর কোনো প্রতিবাদী প্রতিফলন কি বর্তমান সাহিত্য-সংস্কৃতি নামক যা কিছু রয়েছে, তাতে দেখানো হচ্ছে?

৩। আরো অর্থের লোলুপতায় আমরা আমাদের খাদ্যতালিকার প্রায় সব খাবার, শস্য, ফল-মূল সবকিছুতেই বিষ প্রয়োগ করছি। যে বিষে কখনো কখনো প্রত্যক্ষ ভাবেই অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। আর যারা মরছে না, তাদের দেহের স্বাভাবিকতার বিঘ্ন ঘটছে। যার পরিণামে যে বয়সে চুল পাকার কথা নয় তা পাঁকছে, যে বয়সে দাঁত পড়ার কথা নয়, দাঁত পড়ে যাচ্ছে। যে বয়সে মারা যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু মানুষ তার আগেই মারা যাচ্ছে। অর্থাৎ দেহগতভাবে স্বাভাবিক-সুস্থ-স্বাচ্ছন্দ্যে আমরা জীবন নির্বাহ করতে পারছি না। আমরা যারা মুনাফার দৌড়ের প্রতিযোগিতায় নেমে মানব জীবনে বিষ ছড়াচ্ছি এবং আরো বেশি টাকা করছি, এটা কি ব্যক্তি তথা সমাজের স্বাভাবিক ছন্দ, না আসুরিক মূঢ়ত্বে ব্যক্তির আত্মহত্যার সামিল?

৪। যে কৃষক ঋণ নিয়ে আলু চাষ করল, কিংবা পেঁয়াজ অথবা গম, তারা যখন ঐ ফসল তুলে বাজারে গেল, তখন সেগুলির দাম এতটাই কম যে, বিক্রি হচ্ছে না। তখন তারা কোথাও ফেলে দিচ্ছে কোথাও হয়ত সামান্য দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। ফসলগুলি বয়ে আনার মূল্য কখনো কখনো ঐ দামে পাওয়া যায় না। বিপর্যস্ত কৃষক এমনি দেহমানসিক ভারসাম্যহীনতা

নিয়ে বাড়ি ফিরছে যে, বাড়ির মানুষের সামান্য কিছু কথাতেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে। জীবন শেষ করে ফেলে। আত্মহত্যা করছে মহাজনী ঋণ ও ঋণের সুদের চাপে। এতে কি ঐ বাজার যারা চালায়, বা বাজারের যারা দাম নির্ধারণ করে, কিংবা যারা কৃষককে ঋণ দেয়, অথবা সমাজের আর যারা রয়েছে, তাদের মন বা হৃদয়ে কোথাও দাগ কাটছে? কাটছে না।

৫। কৃষকের মত শ্রমিকেরও একই হাল। যে সকল শ্রমিক প্রতি ঘন্টা, মিনিট, দিন-রাত উৎপাদন করছে কলকারখানা গুলিতে, সেইসব উৎপাদিত দ্রব্যে তাদের কোনো হক নেই। যৎ সামান্য মজুরি দিয়েই শেষ। অথচ আমরা যদি শ্রমিকের দেহের চেহারা ও মালিকের চেহারার একটু তুলনা করি, শ্রমিকের বাড়ির কাঠামো ও মালিকের বাড়ির কাঠামোর তুলনা করি, শ্রমিকের ছেলেমেয়েদের সাথে মালিকের ছেলেমেয়েদের তুলনা করি, সেখানেই পরিষ্কার হয়ে যায় মানবতার কত কঠোরতম লাঞ্ছনা, শোষণ, নিপীড়ন, আর্তনাদ। কিন্তু সমাজের তাতে কি কিছু যায় আসে, না ঐ কর্পোরেট গোষ্ঠীর কারোর কিছু যায় আসে? এটা কি সমাজের সুস্থতার পরিজ্ঞাতি?

অতএব, উপরের যে সকল নমুনা বা সমাজ চিত্রের দৃষ্টান্তগুলি উল্লেখ করা হল, সেইগুলি তথা মানব হত্যা, ধর্ষণ, মানুষের কেনাবেচা, নারীদের পণ্য করা, কৃষকের আত্মহত্যা, শ্রমিকের জরাজীর্ণতা প্রভৃতি দেখে ব্যক্তি তথা সমাজের অনুভূতিতে কোনো সাড়া নেই। সমাজ আজ অসাড়, অচেতন। তাই তো মনে কোনো দাগ কাটে না, হৃদয় আজ পাষাণ। সমাজে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, ভাবনা নেই। সমাজ তথা ব্যক্তি সত্তা প্যারালাইজড হয়ে গেছে প্রায় সমস্তটাই। সমাজে কব নেই, তাই কবিতাও নেই। সমাজ বিশ্লেষণের গভীরতা, সূক্ষ্মতা, তীক্ষ্ণতা নেই। তাই সাহিত্য, প্রবন্ধ, গল্প , উপন্যাস, নাটক কোনো কিছুই নেই। সমাজের এই পঙ্কিলতা ভেদ করে আলো ও অন্ধকারের মেরুকরণ ঘটিয়ে সমাজকে দিশা দেখানোর মতো কোনো বৃন্দাবনী ট্যালেন্ট নেই। তাই কর্পোরেটী অপশক্তি ১৯৯১ এ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পরই ঘোষণা করল যে, ইতিহাসের মৃত্যু ঘটেছে। আর কোনো ইতিহাস রচিত হবে না। যা হবে তা হল সভ্যতার সংঘর্ষ। অর্থাৎ clash of civilization. এইভাবেই আর্থসমাজ চলবে। তারাই আজকের সমাজের ঈশ্বর সেজেছে। ভুলে গেছে যে তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করতে পারেনি। ঈশ্বর থেকে তথা মহাআমির থেকেই মানুষের সৃষ্টি। ঐ মানব জাতির মধ্যেই তারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের সাথে তুলনা করছে, সমতুল্য করে ফেলছে। কিন্তু আমরা যদি ইতিহাসের দিকে নজর দিই, তাহলেই এই রক্ষণকামিতার হুঙ্কারী ভবিষ্যৎবাণী ঘোষণার জারিজুরি ফানুস চুপসে যায়।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছরের মানব সভ্যতার এই গতিধারা। আজকের এই সভ্যতা একদিনে গড়ে ওঠেনি। মানুষের দীর্ঘ বছরের পরিশ্রমেই তিলে তিলে এই সভ্যতা গড়ে ওঠেছে। আজ আমরা পৃথিবীর যে জনপদেই দৃষ্টিপাত করি না কেন, দেখতে পাবো তাদের প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান আধুনিক সভ্যতা কীভাবে মানুষ গড়েছে।

সভ্যতার প্রথমভাগেই ভারতীয় আর্য সভ্যতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীতে সেখানেই খ্রিঃ পূঃ দুই হাজার এবং তৎপরবর্তীর মধ্যে পুরাণ ও বেদের বিকাশ ঘটে। উপনিষদ, রামায়ণ ও মহাভারত, গীতা প্রভৃতি তথা ভারতীয় দর্শনের সূচনা ঘটে। যা মানব জীবনের নীতিমালা। যে নীতিমালায় জীবনকে গড়তে পারলেই পুষ্পসম সুরভিত ও সৌন্দর্য্যে মুখরিত হয়ে সমাজ জীবনে গড়ে ওঠে বৃন্দাবনী নন্দকানন।

কিন্তু রক্ষণকামিতা তথা অসুর বা ইবলিস বা শয়তান মানুষ তথা সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তাকে লাগাম দিয়ে জোয়ালে জুড়ে রাখতে না পারলেই তার জাল বিস্তার করে। মানব সমাজ তথা মানবতাকে জড়িয়ে পেঁচিয়ে ধরে। তাই-ই করল। আর্য ঋষি দর্শিত মানুষের গুন ভিত্তিক বিভাজনকে জাতিভেদে রূপ দিয়ে ব্রাহ্মণ্য পরগাছা সংক্রামিত হল। তারই প্রতিবাদে প্রতিবাদী বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উদ্ভব ঘটল। আর সেই প্রতিবাদের মোকাবিলায় ব্রাহ্মণ্যবাদ লেজ গুটালো।

আবার রক্ষণকামিতা ছাড়া পেয়ে ঐ জীবন দর্শনকে তার ছাঁচে ফেলে দিল। কিন্তু সে কি একেবারেই ছাড়া পেয়ে গেল? না, আবার প্রতিবাদ হল চৈতন্যের প্রেমের বাণীতে। রক্ষ সেখানেও মার খেল দ্বাদশ শতাব্দীতে। কিন্তু তাঁকেও শেষ করে দেবতার আসনে বসিয়ে দিল। তার অনুগামীদের খোল করতাল ধরিয়ে দিল। মানব সমাজ তাঁর বাণীকে জীবনের সাথে অভিযোজিত করতে না পেরে বাড়িতে দেহে নানাবিধ পুঁতি-যুতি ধারণ করতে থাকল। সেই ছাড়া পাওয়া আজ অবধি চলছে।

মাঝে মুঘল এসে দেশ দখল করল। রাজকীয় বাদশাহি ঢঙে তারা এই জনপদে থেকেই সমাজ পরিচালনা করল। কিন্তু অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে না পেরে বন্ধ্যা করে ফেলল। সেই সুযোগেই ইংরেজ বেনিয়ারা ভারতীয় সমাজে থাবা বসাল। দুশো বছর শোষন-শাষণ চালাল। ভারতীয় সমাজ মনে নানা ধরনের বিষ ছড়াল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ বীজ পুঁতল। তাদেরকে ভারতীয় সমকালীন চিন্তা চেতনার কাছে পিছু হটতে হল। দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু দেশ তথা সমাজটাকে ভেঙে-দুমড়ে-মুচড়ে বিশাল পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে তারা তাদের দেশে পাড়ি দিল।

সেখানেও আমরা রবীন্দ্র-নজরুল-শরৎ-মানিক প্রমুখের মতো বৃন্দাবনী ট্যালেন্টকে যেমন পেয়েছি, তেমনি নেতাজির মতো ট্যালেন্টকেও পেয়েছি। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মানবিক কণ্ঠের নেতৃত্বকেও পেয়েছি। কিন্তু তারপর এখন বর্তমানের শিল্প, সাহিত্যের ক্ষেত্রগুলি সবই শূন্য।

আবার আমরা যদি মিশরের দিকে তাকাই, সেখানেও মানবতার ইতিহাস নির্মানী যজ্ঞ দেখতে পাই। ইব্রাহিম, ইসমাইল থেকে শুরু করে হযরত মুসার (আঃ) প্রতিবাদের ইতিহাস। হযরত মুসা ফেরাউনের হাত থেকে মিশরীয় জনপদকে মুক্তি দিয়ে সেখানে ইতিহাস নির্মাণ করেন। এরপর যিশুর প্রেমের বাণীর কাছে রক্ষণকামিতার পরাজয়ের ইতিহাস। কিন্তু সেই রক্ষই আবার যিশুকে বানিয়ে দিল দেবতা। নিয়ে আসল ত্রিত্ববাদ।

৫৭০ খ্রিঃ মক্কায় হযরত মহম্মদ জন্ম। ৬৩০ খ্রিঃ তিনি মক্কায় রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটালেন। পূর্ণাঙ্গিক জীবন বস্তুত্বের আর্থসমাজ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন ঘটালেন। যে আর্থসমাজ ছিল খণ্ড বিখণ্ড, হানাহানি ও অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাঁর অনুসারিগণ এই শান্তি সার্বিক আর্থসমাজ ব্যবস্থাপনাকে ৬৬১ খ্রিঃ অবধি পরিচালনা করেন। কিন্তু যেই মোয়াবিয়া ক্ষমতা দখল করল, সেই থেকে চালু হল বংশানুক্রমিক ক্ষমতাতন্ত্র। জাকাত ব্যবস্থায় নিয়ে এল অভিজাতদের রক্ষাকবজী নানান সুবিধা-ছাড়। রক্ষণকামিতা আবার ছাড়া পেয়ে গেল। সে তার ছাঁচে ঢালাই করা রীতিনীতির বিস্তার ঘটাল। বর্তমানে ঐ জনপদের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণার সকল দ্বার বন্ধ করে দিয়ে হানাহানি-খুনের রাজতান্ত্রিক শাসন-শোষনের জাহেলিপনায় মত্ত।

ইউরোপীয় ইতিহাসের দিকে নজর দিই, সেখানেও দেখতে পাই ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার রূপরেখা। সেই বিপ্লবের ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল মহাদেশের অন্যান্য প্রান্তেও। এই বিপ্লব ঘটাতে সমাজকে সেনসেটিভ করার কাজ করেছিলেন ভলতেয়ার, মন্তেস্কু, রুশো প্রমুখ ব্যক্তিত্ব।

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লব, ইউরোপে এক নতুন আর্থসমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিল। যেখানে লেনিনীয় নেতৃত্বে মার্কসীয় তত্ত্বের রাজনৈতিক প্রয়োগ ঘটল। কিন্তু এই বিপ্লব কি একদিনে ঘটল? না, প্রায় দীর্ঘ দুশো বছরের সাংস্কৃতিক কর্ষণের ফলস্বরূপ এই বৈপ্লবিক সমাজব্যবস্থার উদবোধন। রক্ষণকামিতা নিজেকে গুটিয়ে নিলো। ১৯৯১ অবধি রক্ষকে লাগামের মধ্যে রাখা সম্ভব হয়েছিল। তারপর থেকেই রক্ষণকামিতা তার জাল ছড়াতে লাগল। চলতে থাকল এক নেগেটিভ শক্তির হাত থেকে অপর নেগেটিভ অপশক্তির পালাবদলের কাহিনি।

অতএব আমরা দেখলাম, মানব সভ্যতার এই পাচ হাজার বছরের ইতিহাসে বিভিন্ন জনপদেই রক্ষণকামিতাকে বিভিন্ন সময়েই ঝাঁপিতে বন্ধ করা গেছে। তাঁর লাগাম কষা গেছে। সেগুলি আজ অতীতের ইতিহাস। 'বর্তমানে ইতিহাস আর রচিত হবে না।'

রক্ষের এই জাদুকরী ঘোষণার কোনো ভিত্তি নেই। এই জন্যই ঋষির মহান উক্তি— সম্ভবামি যুগে যুগে। যুগ সম্ভবামি অতীতে ইতিহাস নির্মান করেছেন। আর্থসমাজের মুক্তি ঘটিয়েছেন। সেখানে ব্যক্তি, আর্থসমাজ ও ট্যালেন্টের কী ভূমিকা তাও সেই ইতিহাস দেখিয়েছে।

রক্ষণকামিতার আজ দাপাদাপি চলছে, তা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। যার স্বরূপ বর্তমান আর্থসমাজের চেতনাহীনতা তথা সংজ্ঞাহীনতা।

এখন এই প্যারালাইজড সোসাইটিকে কে করবে সেনসেটিভ? এই অসাড়তায় সংজ্ঞার সঞ্চার ঘটিয়ে আর্থসমাজকে সেনসেটিভ করতে পারে ট্যালেন্ট। এই ট্যালেন্ট কীভাবে পাওয়া সম্ভব?

ট্যালেন্টের জন্ম দেয় সমাজ। সমাজের দম্পতি। কোন দম্পতি? সেই দম্পতি, যারা পরিকল্পিত মুক্ত দাম্পত্যের বাস্তবায়ন ঘটিয়ে আর্থসামাজিক যন্ত্রণাকে নিজ দেহমনে জারণ করে সাংস্কৃতিক কর্ষণ তথা আমিত্বিক চর্চায় পরবর্তী প্রজন্মে তা সঞ্চারিত করে দেয়। আর্থসামাজিক গর্ভায়নে ট্যালেন্টের আবির্ভাব ঘটে।

পরিকল্পনার মুক্ত দাম্পত্য কী করে পাওয়া সম্ভব?

পরিকল্পিত বাস্তবানুগ মুক্ত দাম্পত্য পেতে প্রাথমিকভাবে তিনটি বিষয়ের উপরে দম্পতির নিয়ন্ত্রণ দরকার।

১। দম্পতির পরস্পরকে ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পতি না ভাবা। অর্থাৎ দম্পতির জায়া ও পতি কেউই কারোর সম্পত্তি নয়। কেউই কারোর কাছে বোঝা বা প্রতিবন্ধক নয়। দম্পতির কারোর প্রতি কোনো প্রকার সন্দেহ না থাকা। কিন্তু উভয়ের প্রতি মানবিক, সচেতন, দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী ও সহযোগী।

২। দম্পতির যন্ত্রবৎ যৌনতার সম্পর্ক না থাকা। অর্থাৎ প্রস্তুতিহীন, প্রেমহীন, পরশহীন যৌনতায় না যাওয়া। দম্পতির যৌন সম্পর্ক হবে, নরের দিক থেকে হৃদয়বৃত্তিক শক্তিময় রমণীয়তা এবং নারীর থেকে হৃদয়বৃত্তিক শক্তিময় কমনীয়তার সম্পর্ক। এর জন্য উভয়ের প্রতি আভাসনী চর্চা থাকতে হবে। যাতে উভয়েই উভয়ের চাওয়ার প্রতি মুহূর্তের রিডিং নিতে পারে। তাই তাদের শুভ দৃষ্টির প্রয়োজন। শুভদৃষ্টি ঘটলেই অষ্ট প্রকার দানে সাড়া দিয়ে তা প্রদান ও দাম্পত্য জীবনভোগ করতে পারবে।

৩। দম্পতির আরো বেশি অর্থমুখীন না হওয়া। অর্থাৎ প্রয়োজনের সীমারেখা নির্ধারণ করা। যেই সীমা থেকেই জীবন বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ রেখে অবশিষ্ট অর্থের যথার্থ ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ আর্থসামাজিক ফান্ডে অর্পণ করা। জীবন বিকাশক অর্থের ভোগেই ঐ ত্যাগ। যা ভারতীয় দর্শনে— ত্যাগেই ভোগ। আর ইসলামে জাকাত অর্থাৎ আমিত্ব খালাসগত ত্যাগ বা কুরবানি।

উপরের উল্লিখিত এই তিনটি বিষয় বস্তুগতভাবে জীবনের প্রাকটিসে আনতে হয়। তবে এগুলিই শেষ কথা নয়। দম্পতির মধ্যে আমিত্বের কর্ষণ থাকতে হয়। দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় সত্তায় থাকা আমিত্বকে চেতনার অতল তল থেকে চেতনার সর্বোচ্চে নিয়ে যাওয়ার অ্যাকশন প্ল্যান থাকতে হয়। অর্থাৎ কিনা সাবজেক্টিভিটি থেকে অবজেক্টিভিটি অভিমুখীন হতে হয়।

তবেই আমরা দম্পতির মধ্য থেকে মানবতার লাঞ্ছনার সমাধানী ট্যালেন্ট পেতে পারি। যে এই মৃতপ্রায় সমাজে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে। প্যারালাইজড আর্থসমাজ মানসে নতুন উদ্দীপনার সঞ্জীবন ঘটায়।

তাহলে আমরা যারা ট্যালেন্ট নই, তাদের কি কোনো ভূমিকা নেই? এই প্যারালাইজড অবস্থাকে যারা অন্ততঃ প্রশ্ন করছি? অথবা জানছি, অনুভব করছি, তারা বা তাদের?

সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিরই মেধার তারতম্য আছে, প্রত্যেকেই সত্তার অধিকারী। প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কেউ যেমন তুলির আঁচড়ে সমাজকাঠামোর এই জরাজীর্ণতাকে তুলে ধরবেন। আবার অন্য কেউ তা গল্প, প্রবন্ধ, গান, কবিতা, নাটক, সিনেমা, নৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে সেই অনুভূত

মানবতার লাঞ্ছনার প্রকাশে ও তার থেকে নিস্তার পাওয়ার দিশা দিতে পারেন।

অতএব, আমাদের দুটি আশু কতর্ব্য হল –

১) সত্তায় থাকা আনন্দ শক্তির অনুভূতিকে আরো বেশি করে সজাগ, সচেতন, সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, তীব্র করে ব্যক্তি তথা সমাজ মানবতার প্রতিবন্ধকতাকে চিহ্নিত করা এবং ব্যক্তি চরিত্র গঠন ও অনুশীলন করা।

২) বাস্তবানুগ পরিকল্পিত মুক্ত দাম্পত্য গঠন করা। কারণ ইতিহাস এটাও প্রমাণ করেছে যে, শুধু একটু মুক্ত দাম্পত্যেই ঘরে ঘরে প্রতিভা জন্ম নেয়। যেমন, ঊনবিংশের মুক্ত দাম্পত্যের ফলেই বিংশের বিপ্লব।

রক্ষণকামিতা

উজান

দেহ কাঠামোগত ভাবে এবং চেতনাগত ভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা। এই সৃষ্টি সেরা মানুষের মধ্যে একজন কেউ বাইরে থেকে সুন্দরবনের দিকে একবার তাকাল বা অন্য কেউ সারা জীবন সুন্দরবনের দিকে তাকিয়েই থাকল, তাতে কি বনের ভেতরটা দেখা যায়? না, কিছুই দেখা যায় না, অন্ধকার আর অন্ধকার। মানুষের সত্তাও এক সুন্দরবন। এর দেহসদন প্রকৃতিতেও শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার।

এই জঙ্গলের আলোকভেদী সম্যক পরিচিতিই মানুষকে তার স্বরূপটি দর্শন করায়।

কী আছে এই জঙ্গলে? এই জঙ্গলে সাপ, হাতি, বাঘ, ইঁদুর, পেঁচা, বেঁজি, খাট্টাস সবই আছে। মানবদেহ মহাবিশ্বপ্রকৃতির সর্বাণু ব্যঞ্জনে গঠিত। মানে মানবদেহে এমন পদার্থ নেই যা মহাবিশ্বে নেই বা মহাবিশ্বে এমন পদার্থ নেই যা মানবদেহে নেই। এই সর্বাণু ব্যঞ্জনের মানব সত্তার অন্দরেই লুকিয়ে থাকে মুষিকবৃত্তি। মুষিক বা ইঁদুরের স্বভাব হল কৃষকের ধান গোপন সুড়ঙ্গে খাল কেটে ঢুকিয়ে নেওয়া। যদিও যা সে জমা করে তার যৎসামান্যই তার প্রয়োজনে আসে। ঠিক মানুষের সত্তাতেও রয়েছে এই মুষিকের বৈশিষ্ট্য, যা তার অনধিকার দখলদারিত্ব।

কুক্ষিবৃত্তি

পুরাণকার দেখিয়েছেন গণেশের বাহন ইঁদুর, মাথাটা হাতির। ইঁদুর গোপনে ধন হাতির শুঁড় দিয়ে মোটা পেটে জমা করে চলে। গণেশের মাথাটা হাতির মানে চেতনার চর্চাহীন হস্তিমূর্খ। হস্তিমূর্খ মানুষ জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা না করে ধন সম্পদ কুক্ষি শুরু করলে দেহটা হয়ে পড়ে কুবের, মানে বিকৃত শরীর। আর এদের পাল্লাভারী হলে আর্থ-সমাজ পড়ে যায় নেতৃত্বহীন কর্পোরেট দখলে। শ্রমমূল্য চুরি করে, কুক্ষি করে ধনশালী, বিত্তশালী হয়ে ওঠে।

সর্পবৃত্তি

সিনেমায় কিংবা গল্প-উপন্যাসে যেখানেই গচ্ছিত ধন সম্পদ সেখানেই আমরা সাপ দেখতে পাই। মানে কোন ব্যক্তি, ধরুন আজকের কর্পোরেট, ঐ ধন বা মূল্য হোর্ড করছে, তখন তার সত্তার স্বরূপটাই সাপ।

এই সাপ ইর্ষা-হিংসার প্রতীক। অধিকার নেই তবু ঐ ধন হোর্ড করতে গিয়ে তাকে সাপকে পাহ্‌রায় বসাতে হয়, পাছে কেউ তা না নিয়ে নিতে পারে, অতন্দ্র প্রহরা দরকার। তাহলে আমরা কি দেখছি দেহ সদন প্রকৃতির ইঁদুরবৃত্তি ধন হোর্ড করছে এবং সর্পবৃত্তি তা পাহারা দিচ্ছে। এখন মোটা দাগের একটা প্রশ্ন উঠবে কার ইন্ধনে কেন মানুষ ধন জমা করে, মূল্য চুরি করে সুইস ব্যাঙ্কে ফেলে রাখে?

মানবসত্তা

এর উত্তর অন্বেষণ করতে গেলেই সত্তার পাঠ পরিচিতি দরকার। মানুষের সত্তার দুটি অংশ– ধরে নেওয়া যায় এর একটি অংশ আলোকময় কর্মচঞ্চল দিন, অপর ভাগটি অন্ধকার রাত। দিনের বেলায় মেঘ কখনও কখনও দিনের আলো ম্লান করে দেয় কিন্তু সবটা অন্ধকার করতে পারে না, কিন্তু রাত শেষে সূর্য উঠলেই সকল অন্ধকার দূরীভূত হয়। সত্তা ইতি ও নেতি সম্মিলনে গঠিত। ইতি ও নেতি সর্বদাই একে অপরকে অধিকার করতে চায়, কখনোই একে অপরকে মানতে চায় না। নেতি কখনোই ইতিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করতে পারে না, সংক্রামিত করে, কিন্তু সূর্য যেমন রাতের অবসান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ অন্ধকার দূরীভূত করে তেমনই ইতি নেতিকে সম্পূর্ণ আয়ত্ব করতে পারে।

আমিত্ব ও রক্ষণকাম শক্তি

সত্তার এই দুটি অংশের পজিটিভটি হল আমিত্ব এবং অপরটি নেগেটিভ রক্ষণকামিতা। এই পজিটিভ আমিত্বকে নেগেটিভ রক্ষণকামিতার উপর বিজয় অর্জন

করেই সত্তা থেকে আমিত্বের নিষ্ক্রমণ ঘটাতে হয়। যার স্টার্টিং পয়েন্টটি হল শুভ-অশুভের বোধ, ভাল-মন্দের বোধ, হালাল-হারামের বোধ, ন্যায়-অন্যায়ের বোধের দ্বান্দ্বিকতায় আমিত্বের জাগরণ, আমিত্বের সত্তা নিষ্ক্রমণ। জল যেমন নিচের দিকে গড়িয়ে চলে তেমনি মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই নেগেটিভ রক্ষণকামিতার কবলে থাকে, অর্থাৎ জলকে নিচ থেকে উপরে তুলতে যেমন শক্তি প্রয়োগ করতে হয়, তেমন রক্ষণকামিতার উপর আমিত্বকে বিজয় অর্জন করতে হলে দ্বান্দ্বিকতায় শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। না হলে রক্ষণকামিতা ব্যক্তির আমিত্বকে ব্ল্যাকমেইল করে ধন রূপ আর্বজনা মানে দুর্যোধন বানিয়ে দেয়।

আমিত্ব বিকাশের যজ্ঞ

মানুষ শ্রম দিয়ে মূল্য উৎপাদন করে। এই মূল্যকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়- মূল্য হল তা-ই যা মানুষের মূলগত পরিণতি বিকাশক। আর এই মূল্ হল তার আমিত্ব। আমিত্ব বিকাশের জন্য ব্যক্তির শ্রম-মূল্যের যতটুকু প্রয়োজন তাই-ই ঐ ব্যক্তির আবশ্যিক মূল্য।

ধরুন সাধনের মাসান্তে উৎপাদিত মূল্য x টাকা। এখন সাধন ও তার উপর নির্ভরশীলদের থাকা খাওয়া, পরা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি বাবদ মাসিক x1 টাকা প্রয়োজন। ঐ x1 পরিমাণ টাকাই হল তাদের আমিত্ব বিকাশের ভোগ্য। বাকি থাকা (x-x1) পরিমাণ টাকা সে ব্যক্তি মালিকানায় রেখে দেয়। ঐতিহাসিক ইসলামে (x-x1) টাকাই ছিল জাকাত মূল্য। কমিউনিজমে (x-x1) টাকাকে বলা হল ব্যক্তির উদবৃত্ত মূল্য। এই জাকাত মূল্য বা উদবৃত্ত মূল্য সাধনের কাছে বোঝা, আবর্জনা, অব্যবহৃত কিন্তু আর্থসমাজে তার যথার্থ বিন্যাসেই তা সম্পদ। (x-x1) পরিমাণ মূল্য যা ঐ ব্যক্তি দখল বা চুরি করে নেয় তা তার আমিত্ব বিকাশে কাজে আসে না, তা হয়ে যায় আমিত্বে রক্ষের সংক্রামক। এই উদবৃত্ত মূল্য ব্যক্তি মালিকানায় ব্যক্তির চেতনার উপর বোঝা স্বরূপ। এখন দেখা যাক আমরা এই উদবৃত্ত ত্যাগ করতে পারি না কেন?

দেদার, বাহারি পদব্যঞ্জন সহযোগে নুটুবাবু আহার করতে বসে লোভে পড়ে বেশি বেশি করে খাওয়া অভ্যাস করে নিল। ক্রমেই নুটুবাবু মেদবহুল হস্তিমার্কা অস্বস্তির আগার হয়ে পড়লেন। এখন তার উঠতে, বসতে, শুতে সবেতেই অস্বস্তি। এই অস্বস্তির উৎসের ফ্ল্যাসব্যাকে আমরা দেখতে পাই নুটুবাবুর খাবারের প্রতি লোভ যা তার প্রয়োজনের সীমা লঙ্ঘন করিয়ে দেয় তারই অজান্তে। দেহ টিকিয়ে রাখতে যা যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত বা আমিত্ব বিকাশের জন্য যা প্রয়োজন তার অতিরিক্ত যা কিছু ব্যক্তি জমা করে, তার জন্য দায়ী ঐ ব্যক্তির সত্তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকা রক্ষণকামিতা। অর্থাৎ এই প্রয়োজন অতিরিক্ত ভোগ বা জড়ভোগ বেড়ে গেলেই চেতনার উপর তখন ঐ জড় মাতামাতি দাপাদাপি শুরু করে দেয়। আর্থসমাজ শান্তি স্বস্তি হারিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় পরিণত হয়।

জ্ঞান-বিশ্বাস-সংগ্রাম

নুটু বাবুর লোভ তার দেহ-মনের অস্বস্তি উদ্রেকের কারণ। অস্বস্তি তাকেই দূর করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তির প্রবৃত্তিক নিয়ন্ত্রণেই রক্ষণকামিতা জব্দ। আর এই নিয়ন্ত্রণ ব্যক্তি তখনই করতে পারে যখন তার সামগ্রিক জীবন চর্চায় ইতিবাচকতা প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ মন যখন পদার্থের উপর প্রভাবশীল হয়। মন থেকে মনন অর্থাৎ আমিত্ব চেতনার কর্ষণ করেই জীবন ও জগতের জ্ঞান অর্জন করতে হয়। অর্জিত জ্ঞানের উপলব্ধিগত বিশ্বাস বা শক্তিতে নিজ আমিত্ব চেতনার ক্রম উর্দ্ধায়ন ঘটাতে হয়। চেতনার এই উন্নততর বিশেষণে আর্থসমাজকে প্রভাবিত করে নন্দনকানন গড়ার সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রামের আবশ্যিক অঙ্গ শ্রম, উৎপাদন, মূল্য, মূল্যবিভাজন ও বিভাজিত মূল্যের আর্থসামাজিক বিন্যাস। যা করতে গেলে প্রথমেই দরকার সংস্কার- কুসংস্কার- ঐতিহ্য এর রাহুমুক্তি।

মানবতার কর্ষণ

প্রভাস গোস্বামী

আর্থসামাজিক ও ব্যক্তিগত ভাবে দুটি কর্ণার দেখা যায়। এক, গালগুজবি হেয়ালি কর্ণারে থাকে নিন্দুক। আর দ্বিতীয় কর্ণার হল ঘানি টানা ধৃতরাষ্ট্রিক অন্ধত্ব। এছাড়াও আরেকটি কর্ণার থাকে জ্ঞান পাপী ভীষ্ম কর্ণার।

গালগুজবি কর্ণারের সাপোর্ট রক্ষ পায় পরোক্ষে। ঘানি টানা কর্ণারের সাপোর্ট পায় প্রত্যক্ষভাবে। আর জ্ঞানপাপীদের সাপোর্ট পায় তারা নুন খেয়ে গুন গাওয়া কীর্তনে। এটাই হল রাবনের (রক্ষের) দশ মাথার তিন কোণ যেখানে সে গুটিসুটি মেরে জালের আড়ালে থাকে আর আর্থসমাজকে এভাবেই স্লো পয়জন করে।

মানুষকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হলে ব্যক্তি স্বাধীনতা (নিজ আমিকে) না হারিয়ে তাকে পরাধীনতার পাঁকে না পুঁতে সৃজনশীল উদভাবনশীল হতে হয়। কিন্তু রক্ষ কবলিত আর্থসমাজ কী করে? নানা প্রথা পালন আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে মানুষকে ঢুকিয়ে দেয়। তাতে মানুষ প্রথা পালনী পুণ্যার্জনের মোহে নানান সেকটারিয়ান ব্লকে ভিন্ন ভিন্ন প্রথায় অনুষ্ঠান করে যায়।

মূল্য উৎপাদনের জন্য শ্রমে অংশগ্রহণ আবশ্যিক কিন্তু যোগ্যতার নিরিখে সেই কর্ম ক্ষেত্রের অভাব। অভাব বোধ থেকেই আসে প্রয়োজনের তাগিদ কিন্তু যদি রংবাহারি সেন্টিমেন্টের খপ্পরে পড়ে ওপরওয়ালায় সব ঠিক করে দেবে এই ভাবনাই বসে থাকা যায় তা হলে যা হবার তাই হবে, যা এখন পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে।

সৃষ্টি সেরা মানুষ আবার জন্মগতভাবেই রহস্যাচ্ছন্ন ও অনধিকার দখল কামনা প্রবণ। অনধিকারকে অধিকার করার বোধই হল মানুষের মানস রক্ষণকাম বা মানস পুঁজি। এখান থেকে জন্ম নেয় পুঁজি মানসের অর্থাৎ দখল রক্ষা করার বোধ। মানব সত্তার মধ্যে নিহিত এর উত্তর। ইতি ও নেতির সম্মেলনে গঠিত মানব সত্তা। এরা বৈশিষ্ট্যগত দিক দিয়ে আলাদা, একে অপরকে মানতে চায় না। নেতি বাচক প্রবৃত্তি মানুষকে আনন্দ দেয় না। তার কাজ হল হঠকারিতা, হিংস্রতা, হতাশা, ঈর্ষা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে কাজ করা। কিন্তু ইতি বাচক শক্তির চর্চা করলে মন সদা আনন্দ ও উৎফুল্ল থাকে। কাজ করতে উৎসাহ ও উদ্যমের অভাব হয় না। যখন গোটা আর্থসামাজিক ইতি ও নেতি শক্তি শনাক্তকরণের চর্চা শুরু করে ইতি শক্তির বিজয় কেতন উত্তোলনে ব্রতী হয়, তখন জারতন্ত্র উচ্ছেদ হয়, ফেরাউনি অপশাসন দূর হয়। যা উপমহাদেশের মহাকাব্যে ইঙ্গিতের মধ্য দিয়েও দেখানো হয়েছে। যদি রংবাহারি সেন্টিমেন্টের খপ্পরে পড়ে নিন্দা বা হঁচড়ে পাকামি শুরু করি তাহলে সেই গয়ংগচ্ছতাই থাকবে। অনাবাদি জমিতে ফুল ফোটার জন্য চেয়ে থাকাই হবে, যদি সে জমিতে অর্থাৎ আমিত্ব কর্ষণে ব্রতী না হই।

আমিত্ব বিকাশ ব্যহত হলেই শুরু হয় মূল্য চুরি। আর্থসমাজ বিকাশের রাস্তা তখন বন্ধ। তখন কী প্রয়োজন? জীবন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে দেহমনকে বিকশিত করার কৃৎকলায় প্রত্যয় রেখে আমিত্ববোধকে জাগিয়ে তোলা। প্রয়োজন শ্রম প্রয়োগ, মূল্য উৎপাদন, উৎপাদিত মূল্যের ভোগ যা ব্যক্তির নিজের বিকাশের জন্য ও বিভাজন, বিভাজিত মূল্যের তত্ত্বাবধানী ফান্ডে (প্রত্যয়) ত্যাগ যা আর্থসমাজ বিকাশের জন্য। যা মহাভারত মহাকাব্যের মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে পান্ডবদের স্বর্গ রচনা এবং দাতা কর্ণ আর ভীষ্ম পণ্ডিতি দুয়ের পরিণাম কী দুঃসহ! তত্ত্ব আওড়ানোর ফাঁকেই তখন সে বর্তমানের সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা বিচ্যুত হয়ে রক্ষকেই আড়াল করে অর্থাৎ মূল্য চুরির রাস্তা তৈরি করে। ত্যাগ ভোগ তত্ত্ব তখন প্রথা হয়ে দাঁড়ায়। ধনের পাহাড় থেকে কিছু ভিক্ষা বা কিছু শতাংশ ছাড়াকে যদি কেউ বলে অতিরিক্ত ছাড়ছি তাহলে যথাপূর্বং।

বক্তা ও বক্তব্য

শ্যামল কান্তি পাড়ুই

সাফল্য ও সার্থকতা এক জিনিষ নয়। সাফল্যের খোঁজে জীবনের সিংহভাগ নিয়োজিত করেও শেষে হিসাব মিলাতে গিয়ে কেউ দেখে ফাঁকা ঝুলি আবার কেউ গরমিলের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরে। বুঝতে পারে না জীবনের মূল্যায়নে ঠিক কী পাওয়া গেল। মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য কী? সফল হওয়া নাকি সার্থকতা অর্জন? ইদানিং কারো সঙ্গে কথা হলেই এক চরম হতাশার বাষ্প ঘনায়িত হতে দেখি। সব যেন গেল গেল রব। চারিদিকে অসততা, অপদার্থতা, ধান্দাবাজী, দুর্নীতি। মূল্যবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের সমাজ, পরিবার, ব্যক্তিগত পরিসর থেকেও। বাস্তবে এই হতাশার বহুল কারণের অভাব নেই। পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে পরিপক্ক কোনো ব্যক্তি মানস সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক নানান পরিস্থিতির শিকার হয়ে ভুগতে থাকে নিজের অস্তিত্ব সঙ্কটে। সততা, মূল্যবোধ, করণীয়-অকরণীয়, ব্যক্তি ও বক্তব্যের নানান সংঘর্ষ প্রেক্ষিতে ব্যক্তি জীবনের কিছু বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরাই এই লেখার উদ্দেশ্য।

সেদিন আমার এক অতি পরিচিত দাদা বলছিলেন, অনেক দিন পর দেশের বাড়ি গিয়েছেন। কর্ম সূত্রে বাইরে থাকা মানুষ ঘরে ঢুকলে যা হয়, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ জীবনে। বাড়ির লোকজনের সঙ্গে পাড়া-পড়সি সবার মধ্যেই একটা খোঁজ খোঁজ ভাব। এই কুশল অনুসন্ধানী দলের মধ্যে সেই দাদার এক ক্ষুদে ভাইপোও ছিল। এমনিতেই ঐ ভাইপোর সঙ্গে দাদার সখ্যতা একটু বেশীই। আসলে তার বাবা ঐ দাদার খুবই শ্রদ্ধেয়। যাই হোক, এই ক্ষুদে ভাইপোটি হঠাৎ ঐ দাদার একটা হাত টেনে ধরে বলল, 'জান কাকু আমার বাবা না চোর'। ছোট মুখে এত বড় কথাটা শুনে নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। ইচ্ছে করল ছেলেটার গালে একটা টেনে থাপ্পড় কসিয়ে দিই। আসলে ওর বাবা আমার এতটাই আস্থাভাজন ব্যক্তি যে এই ধরণের কথা ঠিক নিতে পারছিলাম না। যাই হোক, প্রথমত বিশ্বাস, তারপর বিরক্তি কাটিয়ে যখন কৌতূহলে এসে উপনীত হলাম, মুখে প্রায় কথা সরছে না । কিন্তু কিন্তু করে জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তোর বাবা কার কী চুরি করেছে? ছেলেটি উত্তর দেয় – জান কাকু গতকাল আমি বাবার সঙ্গে আমাদের ধান জমি দেখতে গিয়েছিলাম মাঠে। গিয়ে দেখি আমাদের জমিতে একটুও জল নেই। কিন্তু পাশেই অন্য লোকের জমিতে জল থৈ থৈ করছে। বাবা চুপি চুপি পায়ে করে সেই জমির আলবাঁধটা কাটিয়ে দিল। কুল কুল করে জল আমাদের জমি ভিজিয়ে দিল। কথাটা শোনার পর মনে হলো কে বুঝি আমারই গালে একটা থাপ্পড় কসাল। এই ঘটনা, নিষ্পাপ শিশু মনের সরল দৃষ্টির তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ আমার নব চৈত্যনের উন্মেষ ঘটালো। মনে পড়লো সেই অমোঘ বানী - 'কে' বলছে সেটা বড় কথা নয় 'কী' বলছে সেটাই বড় কথা- এমনই ছিল আমার সেই দাদার উপলব্ধি।

এটা একটা ঘটনা মাত্র, এমনি ঘটনা আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত আকছার ঘটে চলেছে। আমরা যারা বড়রা তথাকথিত সমাজের নানান বিষয়ে সিধান্ত গ্রহণের অধিকারী বলে মনে করি, তারা বোধহয় পরমত সহিষ্ণু বা পরমত গ্রাহ্যতাকে খুব একটা পাত্তা দিই না। বিশেষ করে শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও মতামত বড়রা তো খুব গুরুত্ব সহকারে সবসময় ভাবে এমন দাবি খুব একটা করা যায় না। অভিজ্ঞতা কিন্তু ভিন্ন কথা বলে। শিশুদের নিষ্কলঙ্ক নির্মোহ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও মতামত অনেক গুরুতর সমস্যারও খুব সহজ সমাধান বাতলে দিতে পারে। শিশু বা কিশোর ব্যক্তিত্ব বলেই তাকে একবারেই অবজ্ঞা অথবা এড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। শিশু ব্যক্তিত্বেরও যথাযথ মর্যাদা প্রাপ্তির জন্মগত অধিকার বিদ্যমান।

আবার অনেক ক্ষেত্রে বক্তব্যের থেকে ব্যক্তিই বেশী

প্রাধান্য অধিকার করে বসে, যেমন বাড়িতে আমার মায়ের কাছে আমার থেকে আমাদের কুল পুরোহিতের কথার গুরুত্ব অনেক বেশী। বিশেষ করে পুজোর ব্যাপারে। আমার অবশ্য তাতে আপত্তি নেই। কারণ ঐ বিষয়ে ঠাকুর মশায়ই জ্ঞানী ব্যক্তি। আমার সমস্যা পুজোর নাম করে যখন অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনা কায়েম করা হয় ভোগ তৈরিতে, স্নান জল অথবা চরণামৃত তৈরির ক্ষেত্রে। এই প্রসঙ্গে একদিনের কথা মনে পড়ে। তখন স্কুল বেলার অপরাহ্ন কাল। আর কিছুদিন পরেই শুরু হবে নতুন কলেজ জীবন। একদিন মাঘ মাসের বৃহস্পতিবারের সকালে দেখি বাড়ির পুরুতমশায় এসেছেন লক্ষ্মী পুজো করতে। মা অতি সাবধানে অতি সচেতনে জোগাড় করেছেন পুজোর উপচার। তথাপি উপচারে হঠাৎ পাওয়া গেল ঘাটতি। কী নেই- কী নেই- যেন, ও, একটা গোটা সুপুরির অনুপস্থিতি। মায়ের ভীষণ দুশ্চিন্তা, হায় হায় কী হবে ঠাকুরমশাই। পুজোয় খুঁত। ঠাকুরমশাই স্মিত হেঁসে আমার মা জননীর উদ্দেশ্যে বললেন চিন্তা করবেন না কাকিমা, (ঠাকুর মশাই আমার মাকে কাকিমা বলেই ডাকতেন) ষোল আনা ধরে দিন ওতেই চলবে। মাও অবশেষে চিন্তা মুক্ত।

এখন মনে হল 'কে' বলছে সেটাই মুখ্য, 'কী' বলছে তা গৌণ।

এই ঘটনা দেখে আমার একটা দীর্ঘ দিনের অতৃপ্ত বাসনা পূরণের ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠলো। ছোট বেলা থেকেই দেখি পুজোর ঘটের জল ভরা হয় অপরিষ্কার অস্বাস্থ্যকর একটা পুকুরে। পুজোর ভোগও তৈরি করা হয় ঐ দূষিত জলেই। অনেক লড়াই করেও মায়ের এই গোঁড়ামো শোধরাতে পারিনি। মা বলতেন ঠাকুরমশাইয়ের নাকি বিধান আছে টিউবওয়েলের জলে পুজো চলবে না। কারণ কলের বাটিতে নাকি চামড়া আছে। আমি কোন দিনই সেই ভাবে কোন ঠাকুরের প্রসাদ বলে বিতরণ করা দীর্ঘ সময় কেটে রাখা আঢাকা ফলমূল, ভিজানো চিঁড়ে বা অন্য কোনোপ্রকার খাদ্যোপকরণ খাই না, এখন তো স্পর্শও করি না। আমার এই ভগবানহীন জীবনে এক চরম সাধনা ছিল মায়ের এই অন্ধ গোঁড়ামোর ঘোর কাটিয়ে পুজোর নামে দূষিত পুকুরের জল ব্যবহার বন্ধ করা। অগত্যা ঠাকুরমশাইয়ের শরণ নেওয়া। একান্তে আলোচনার পর ঠাকুর মশাইয়ের মুখ দিয়ে বলানো গেলো– 'কাকিমা এখন কলের জলে পুজো চলে'। মায়ের অবিশ্বাস আর তার থেকেও বেশি বিস্ময়! ঠাকুর এ কী বলে? কিন্তু যেদিন দেখলো পুরোহিত নিজের হাতে পুজোর ঘটে কল পাম্প করে জল ভরছে, সেদিন আর কোন বাধা থাকলো না। আমার শুধু মনে হল 'কে' বলছে দেখতে হবে তো! 'কী' বলছে তাতে 'কী' আসে যায়?

মি. 'কে' (প্রকৃত নাম নেওয়া গেল না, ঘটনাটা সত্য) এক উচ্চস্তরীয় জাঁদরেল অফিসার। কথায় কথায় অধস্তন কর্মীদের অকারনে অসম্মান, চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়ে দেওয়ার হুমকি, কারণ দর্শানোর দাবড়ানি দেওয়া তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। বলা বাহুল্য, সরকারি পয়সায় ব্যক্তিগত দরকারি কাজগুলি সারতে তিনি কখনই ভুলেন না। ব্যক্তিগত ক্ষমতার অপপ্রয়োগে মাঝে মাঝে বৌ ছেলে সহ বন্ধু বান্ধবদের পরিবার নিয়ে সরকারি খরচে ঘুরে বেড়ানো তার মুল্যবান 'হবি'। সম্প্রতি পাঁচ পরিবারের চৌদ্দ জন সদস্য নিয়ে জেলা সফরে ঘুরে গেলেন । মুখোশের আড়ালে থাকা মুখগুলো বড়ই বেমানান বাইরের জগতে। প্রত্যন্ত পাহাড় জঙ্গল ঘেরা এক বন্য রিসোর্টে সাহেবের হুকুম ছিল 'কচি পাঁঠার মেটে চচ্চড়ি' চাই সবার জন্য। বেচারা রিসোর্ট ম্যানেজার কিছু না ভেবেই বলে দিয়েছিলো, 'হয়ে যাবে স্যার'। সময়কালে চৌদ্দ জনের জন্য মেটে চচ্চড়ি বানানোর উপকরণ পাওয়া গেল না। একটা কচি পাঁঠার কত টুকুই বা লিভার থাকে বলুন?? চৌদ্দ জনের রসনা তৃপ্তি করতে কতগুলো কচি পাঁঠার প্রয়োজন ভাবুন। বেচারা অল্পবয়স্ক ম্যানেজার ভাবতেই পারেনি এরকম এক প্রত্যন্ত জঙ্গল এলাকায় শুধুমাত্র এতগুলো লোকের জন্য 'মাটন লিভার কারি' বানানো স্রেফ অসম্ভব। তথাপি অনেক চেষ্টায় অল্প কিছু ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। তাতেই সাহেবের বেজায় গোঁসা, 'সবার জন্য মাটন

কারি হল না কেন'? আমার মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছে সেই প্রশ্নটা, 'কে' বলছে সেটাই বড় কথা 'কী' বলছে সেটা অপ্রাসঙ্গিক!

গতানুর্বতিক আর্থসমাজের আনাচ কানাচ থেকে এমন উদাহরণ ভুরি ভুরি দেওয়া যায়। এই অর্থসমাজে শ্রেণি বিভাজন, বর্ণ বিভাজন অর্থাৎ দাসত্বমূলক শ্রম সম্পর্কের বাস্তবতায় 'কে' টাই প্রাধান্য পায়। কী, কেন তো দূর অস্ত। অচলায়তনের গোড়া ধরে টান মারতে গেলে কিন্তু কী, কেন সামনে আনতে হয়। আর তার ভিত্তিতে প্রশ্নমালা সাজিয়ে অগ্রসর হলে ভাসমান জীবনের কূলকিনারা স্পষ্ট করে দেখা যায়। তখন পরিষ্কার হয়ে যায় সাফল্য আর সার্থকতা, নীতি-অনীতি-দূর্নীতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য এবং সত্য আর মিথ্যা। আর্থসমাজ সংস্কৃতি তাতেই প্রাণবন্ত হয়।

গল্প

রোদ্দুরের রং

বৈশালী রায়চৌধুরী

বেশ জমিয়ে শীতটা পড়েছে কদিন ধরে, পারদের ঘর চোদ্দ পনেরোর মধ্যেই। মফঃস্বলের বাজার রাত্রি সাড়ে নটাতেই চারিদিক শুনশান। গায়ের কালো চাদরটা একবার খুলেই আবার টানটান করে গায়ে জড়িয়ে নেয় চৈতালী। অনেকদিন আগেকার চাদরটা, বদলাবে বদলাবে ভাবছে, আর হয়ে উঠছে না। ডাক্তারবাবুর চেম্বারে চাদরটা গায়ে দিতে ভারী লজ্জা করে চৈতালীর। চেম্বারে যতক্ষণ থাকে সোয়েটারেই কাজ চলে যায়। চেম্বার থেকে বেরিয়েই গোটা গায়ে আষ্টেপিষ্টে চাদরটা মুড়ে নেয় চৈতালী।

আজ একটু দেরিই হয়ে গেল। পেশেন্টের চাপ ছিল যে খুব। তার উপর ঠিক পেশাদারী মনোভাবের নয় সে, ডাক্তারবাবু চেম্বার ছেড়ে যাবার পরও সব গুছিয়ে মোছামুছি করে আসে সে। যেটা আদৌ তার কাজ নয়। দশ বছর ধরে একটানা কাজ করছে নামকরা গাইনি অরুণ ভট্টাচার্যের ফিমেল অ্যাটেনডেন্ট হিসেবে। শনি, রবি, বাদ দিয়ে সোম থেকে শুক্র রোজই তার কাজ। সে যায় বেলা চারটের মধ্যে ফেরে রাত্রি নটার পর। কাজে চৈতালী এতটুকু শৈথিল্য দেখিয়েছে, কোনোদিনও কেউ বলতে পারবেনা।

রবীন্দ্রসদন, গার্লস কলেজ খুব জোরে হেঁটে পার হল চৈতালী। জোরে হাঁটার একটা বড় সুফল হল কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডাটা আর চেপে বসে না তেমন। রাস্তার ধারে, কতগুলো ভবঘুরে, আগুন জ্বেলে তাপ নিচ্ছে। সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার জোরে হাঁটা লাগাল সে। আবার বাড়ি.... ছোট গ্যাস... শ্যাওলা ধরা দেওয়াল... অন্ধকার বাথরুম... রাস্তার কল।

টাইপ স্কুলের সামনেই তার পৈতৃক বসত বাড়ি। মা, চৈতালী, দাদা বৌদির বাসগৃহ, যাতায়াতের রাস্তাও পেছন দিকে। তাদের ভাগে একটা বড়ঘর আর চৌকো গ্রিল দিয়ে ঢাকা একটা বারান্দা, যেটা রান্নাঘরও বটে, আবার সময়ে অসময়ে শোয়াও যায়, চৌকি রাখা আছে একটা। উঠোন পেরিয়ে বাঁদিকে বাথরুম। সবকিছুরই অবস্থা খুব খারাপ, বহুদিন হাল ফেরানোর চেষ্টাও করা হয়নি। বাড়ি ফিরতেই গোমড়া মুখ মায়ের। –এত দেরি করলি কেন? সেই সাতটার সময় ঝিন্টুকে দিয়ে গেছে, মায়া। অত দুরন্ত বাচ্চাকে সামলাতে পারি আমি? হাতে পায়ে ব্যাথা ধরে গেছে।

–কী করব ইচ্ছে করে কি দেরি করি আমি?

–করিস। দেয় তো মোটে তিন হাজার টাকা। অত জান প্রাণ দিয়ে খাটার কি আছে। চেম্বার মোছা, টেবিল মোছা, ধোয়াধুয়ি, কি দরকার, যাবি আসবি যতটুকু দরকার করবি, ব্যস হল।

–শুধু দরকার মতো কোথাও আমি কিছু করি না মা। এই যে দেখ ঝিন্টুকে ওর মা সপ্তাহে তিনদিন রেখে নাইট ডিউটিগুলো ধরে, সেই ঝিন্টুকে খাওয়ানো, সামলানো, ঘুম পাড়ানো, আমি ভালোবেসেই করি মা। বলতে তো পারতাম ওর বাবার কাছেই থাক, তা তো কোনো দিন বলিনি।

পরিষ্কার হয়ে ঝিন্টুকে নিয়ে পড়ে চৈতালী। প্রথমে খাওয়ায়, তারপর গল্প বলে ঘুম পাড়ায়, তিন বছরের ছোট্ট শিশুটাকে। কচি কচি হাতগুলোকে গলার উপর থেকে নামিয়ে খাবার দিকে যায়। মা বুড়ো মানুষ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। থালায় চারটে রুটি আর তরকারি নিয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। মীরা বৌদি তার অপেক্ষাতেই ছিল। সামনের বাড়ি থেকে, তার আওয়াজ পেয়ে সেও রুটির থালা হাতে খেতে বসে চৈতালীর পাশে। মীরাবৌদি সেলাই এর কাজ করে। ব্লাউজ তৈরি, সায়া, পাজামা, নাইটি ইত্যাদি। তৈরির কাজে চৈতালীও যুক্ত, তাই বহুদিন ধরেই দুজনের

মধ্যে মানসিক বন্ধন গড়ে উঠেছে।

—আজ ঠাণ্ডাটা ভালই পড়েছে বল?

—হ্যাঁ গো বৌদি। ছেলেরা ঘুমিয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ ছোটটা। বড়টা এখনও আসেইনি।

—সে কি গো, প্রায় এগারোটা বাজে, শীতের রাত্রি।

—কি বলব বল? এতদিনে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে যেত ঠিকঠাক চললে। শুনল না জেরক্স এর দোকানে লেগে গেল। বাকি জীবনটা যে কী হবে? তোমার দাদা অসময়ে চলে গেল। একই দুঃখ, একই চিন্তা, একই কথা, বারবার ঘুরে ফিরে আসে, দুই নারীর কথোপকথনে। দুই সমবয়সি মধ্য চল্লিশের নারী পরস্পর সুখ দুঃখ বিনিময় করে এই সময়েই। তাই পরস্পরের জন্য অপেক্ষা করে ধৈর্য্যহীন ভাবে। ভিন্ন সমস্যা, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, আবার কিছুটা একই রকম।

ডক্টর ভট্টাচার্য চৈতালীকে বলেন যে, কজন আছে দেখে বলত। ডক্টর ভট্টাচার্য নাম ধরে কি মাসি বা দিদি বলেন না। সার নেম ধরে আপনি বলে কথা বলেন যা ভারী মিষ্টি লাগে তার। আসলে ডক্টরের সবকিছুই বড় ভালো লাগে তার...এত মার্জিত, পরিশীলিত।

—সব পেশেন্ট যাবার পর একটু থামবেন তো সময় নিয়ে। কথা আছে।

—আচ্ছা, আর তিনজন আছেন ডক্টর।

এই চেম্বারের কাজটাকে ঠিক কাজ মনে হয় না তার, চেম্বারের যন্ত্রপাতি, ওজনযন্ত্র, প্রেশারমেশিন, সবকিছুই চৈতালীর বড় আপন, আপনার ধন। চেয়ারের উপর টাওয়েল টাও বড় যত্ন করে পাতে সে। টাওয়েল টা পাতার সময় যে মৃদু সুগন্ধ নাকে আসে তাও তার মনকে উদাস করে দেয়। ডক্টর যে সাদা গাড়িটায় চড়ে আসেন, সেদিন চৈতালী দেখে গাড়িটির কাঁচে একটা বিশ্রী দাগ, সবার অগোচরে যত্ন করে মুছে দেয়। কাজের জায়গাটা তার বড় নিষ্ঠার। বড় ভালোবাসার।

পেশেন্ট শেষ করে ডক্টর চেয়ারে বসেই চৈতালীকে বসতে বলেন আর একটা চেয়ারে। বলেন, 'আপনাকে একটা কথা বলি, আমি সামনের মাস থেকে আর কৃষ্ণনগরে থাকছি না, আমার পরিবার তো বছর চারেক আগেই দমদমে আমাদের পৈতৃক বাড়িতে শিফট করে গেছে, জানেনই তো আমি এস. এস. কে. এম এ সুযোগ পেয়েছি, কাজেই...। আপনার কাজটা তো আর থাকবে না। যদি মনে করেন দমদমে যেতে পারেন। মানে কাজটা করতে চাইলে।'

—থাকব কোথায়?

—মায়ের ঘরের লাগোয়া অ্যান্টি রুম মতন আছে। যদি মনে করেন, আশা করি আনন্দেই থাকবেন। বাড়িতে কথা বলুন। ও হ্যাঁ মাইনেটো ছয় হবে। চলবে?

অজস্র রঙিন আলোর বুদবুদ ওঠে মনের মধ্যে। দমদম, ডাক্তারবাবুর প্রাসাদ, ঝকঝকে আলো, শহুরে জীবন, আর কী চাই। জন্ম ইস্তক কৃষ্ণনগরের পোড়ো বাড়ি, বোনেদের বিয়ের দায়িত্ব কর্তব্য ছাড়া তার জীবনে বিশেষ কিছু নেই। মাধ্যমিকের পর তো স্কুলজীবনেরও ইতি। যাক ভগবান হয়ত মুখ তুলে চেয়েছেন। একমাত্র বন্ধন ঝিন্টি। তাও আর কদিনই বা। একটু বড় হলেই মায়ের টান এতটাই বেড়ে যাবে যে, সেই টানে মাসি কোথায় ভেসে যাবে। জীবন দিয়ে বুঝেছে সে।

যাবার দিন এগিয়ে যাবার সাথে সাথে নিজের সামান্য যত্ন আত্তি করতে শুরু করে। সময়মত দুবার স্নান, মুলতানি মাটি, বেসন, এই আর কী। মায়ার আপত্তি ছিল খুব। সে যে নার্সিংহোমের আয়া সেখানে একটা কাজও দেখেছিল তার জন্য। চৈতালী আমল দেয়নি।

ডক্টর বলেন, 'গড়াই আপনি সকাল সাতটার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছাবেন। রতন আপনাকে পৌঁছে দেবে আমার বাড়িতে। চিন্তা করবেন না।'

—আপনি?

—আমিও সকালেই যাব, গাড়িতে।

মনটা একটু খারাপ হয় চৈতালীর। ডক্টরের এত বড় গাড়ি, তার একটু জায়গা হবে না।

দমদমের ছাতাকলে ডক্টরের বিরাট বাড়ি। গ্যারেজে দুখানা গাড়ি। তার কৃষ্ণনগরের শ্যাওলাধরা বাড়ি আর

বর্তমান বাসস্থানের সামঞ্জস্য করা কঠিন। চৈতালীর কাজটাও বদলেছে। ডক্টর হেসে বলেছেন, 'আপনি বরং হোম ডিপার্টমেন্টটা দেখুন। হোম ম্যানেজারের পোস্ট আপনার।' চৈতালী সেই কাজটাই ভারী দক্ষতার সাথে সামলাচ্ছে। সকালে উঠেই বাজার ছোটা, সবকিছু গুছিয়ে গাছিয়ে রান্নার দিদিকে দেওয়া, ফাঁকে ফাঁকে মাসিমার যত্ন, সঙ্গ দেওয়া, হাঁটতে নিয়ে যাওয়া, বউদির কাজের অকাজের সঙ্গী হওয়া তার কাজের মধ্যেই। এছাড়া ড্রাইভার, মালীকে খেতে দেওয়া ইত্যাদি। ও হ্যাঁ বাচ্চাদের কাজটাও চৈতালীই করে এখন।

আসলে কাজে তার ভারী নিষ্ঠা। স্থান কাল পাত্র ভেদ হয় তেমন। শুধু ডক্টরের সাথেই কথা হয় না তেমন। ভারী ব্যস্ত উনি। এরমধ্যেই সপরিবারে উটি থেকে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। মাসিমা আর বাড়ি চৈতালীর তত্ত্বাবধানে রেখে। বউদি তো মাঝে মাঝেই বলেন, যে কী ভাগ্য করে আপনাকে পেয়েছি।

ডক্টর এর বাড়িতে আজ ছোটখাট অনুষ্ঠান। ডক্টরদের জমায়েত, পার্টি মতন। সবকিছু সামলে রাত্রি বারোটার দিকে মাসিমার কাছে নিচের তলায় নেমে আসে চৈতালী। একটু ঘুমটা আসতেই ইন্টারকমে বউদির গলা– 'একটু ওপরে আসুন না।' ফরমায়েস মত উপরে পৌঁছাতেই কানে আসে, এক সুবেশধারী ডক্টরের গলা, 'ভারী এফিসিয়েন্ট' আপনাদের মতন কাজের মেয়েটি। কোথায় পেলেন? ডক্টর ভট্টাচার্য সুর করে বলে ওঠেন–

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর
যা কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর'।

আরে সুব্রত, এ হচ্ছে গিয়ে আধুনিক কালের কেষ্টা। মনে আছে তো, রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য'।

–আচ্ছা, কেষ্টার ফিমেল সংস্করণ, দারুন তো।

কবিতাটা ক্লাস এইট এ ঝড়ঝড়ে মুখস্থ বলেছিল চৈতালী। শিবানী রায় দিদিমণি প্রশংসাও করেছিলেন খুব। কবিতার প্রতিটা লাইনের মানে আজও তার কাছে পরিষ্কার।

কাজটুকু করে নিঃশব্দে নেমে আসে, চৈতালী।

পরেরদিন ডক্টর বেরিয়ে যাবার পর, বউদিকে বলে চৈতালী যে, সে বাড়ি যাবে, মায়ের শরীর খারাপ। দুপুরের ট্রেনে চড়ে বিকেলের মধ্যেই কৃষ্ণনগর পৌঁছায় সে। বাড়ি ঢুকতেই দেখা মায়া বউদির সাথে।

–ওমা, চৈতালী, বাবারে বাবা, এতদিনে মনে পড়ল? কদিন থাকছ তো?

–আর যাব না বৌদি, তোমাদের ছেড়ে ভাল লাগছিল না। এখানেই কিছু করব।

ডুপ্লিকেট দিয়ে তালা খুলে, ঘরের ভিতরে পৌঁছায় সে। খাটে একটা খেলনা গাড়ি হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে ঝিন্টি। মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে। মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমিয়ে মা। একটু পরিষ্কার হয়ে ঝিন্টির পাশে শুয়ে পড়ে চৈতালী। অমনি ঘুমন্ত ঝিন্টি খেলনা ছেড়ে ছোট ছোট হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে চৈতালীকে। ছোট ছোট পা দুটো চাপিয়ে দেয় তার গায়ে।

জানালা দিয়ে বাইরে চোখ যায় চৈতালীর। ভাঙা শ্যাওলা ধরা দেওয়ালের গায়ে হলদে সোনালী রঙের রোদ্দুর, পড়ন্ত সূর্যের। রোদ্দুরেরও যে রঙ আছে। এতদিনে কেন চোখে পড়েনি তাঁর?

ছোটলোক

বরুণ শ্যেন

সুমন্ত সবে অফিস থেকে ফিরেছে। বৌ নমিতা এসে চেঁচাতে শুরু করে,– তোমার আক্কেল হবে কবে জানতে পারি? আমি কিন্তু তোমার সংসারে গাধার খাটুনি খাটতে আসি নি। –বলেই ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'কী হয়েছে**'** বলতে গিয়েও আর বলা হলো না সুমন্তের। **'**ধুরঃ, আর পারা যায় না**'** বলে বিছানায় বসে পড়ে সে।

'আর পারা যায় না**'** কথাটা সুমন্তের এখন কমন শব্দ। নমিতার খাম খেয়ালি আবদার আর অপরিমিত অব্জেকশনে ওই একটা শব্দই তাকে যেন শান্তি দেয়। ভেতরে ভেতরে নমিতার কাছ থেকে পালাতে চায় সে।

ব্যাপারটা কী ঘটেছে তা জানার কোনো উৎসাহ নেই তার। পোশাক ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে বিছানায় এসে আবার বসে। একটা বালিশ টেনে নিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে চোখ বন্ধ করে। সারাদিন অফিস ওয়ার্ক করার পর ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে বউয়ের হাতের গরম চা খেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করবে, সে সৌভাগ্য অনেক দিন থেকেই অদৃশ্য। যান্ত্রিক জীবনে সুমন্তের আবদার করার শক্তিও ফুরিয়েছে।

'কী ব্যাপার চোখ বন্ধ করে আরাম করছো?**'** নমিতার ঝাঁজালো শব্দে চমকে ওঠে।

সুমন্ত রুঢ় স্বরে পাল্টা বলে,– ছোটো লোকের মত চেঁচাচ্ছ কেন?

'কী বললে, আমি ছোটো লোকের মত চেঁচাচ্ছি! অফিস থেকে ফিরে তো বাবুর মত আরাম করছো!বাড়ির কোনো দিকে তো তোমার খেয়াল নেই। কিছু বলতে গেলেই গায়ে ফোসকা পড়ে।**'**

সুমন্ত বুঝতে পারে এই কথাটা নিয়েই এবার নমিতা অশান্তি শুরু করবে। তাই ব্যাপারটা কে একটু লঘু করার চেষ্টা করে, বলে,– তা তো ভালো ভাবে বলতে পারো। এখন বল কী হয়েছে?

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নমিতা অপেক্ষাকৃত শান্ত অভিমান মিশ্রিত গলায় বলে,– বেশি কিছু না, তোমার ছেলের হাত কেটেছে।

এবার সুমন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠে,– কীভাবে? কতটা কেটেছে? বাবু কোথায়? পর পর উদ্বেগের সাথে প্রশ্ন করে যায়।

তাদের যে ঘরটায় পুরনো সব লোহা লক্কড় আছে সেগুলোতে কীভাবে, কী করতে গিয়ে তাদের ছেলের হাত কেটেছে তা বিস্তারিত ভাবে জানায় নমিতা। ছেলেকে নিয়ে কী পরিমান ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, হাতের কাজ ফেলে রেখে ছেলে কে নিয়ে কীভাবে ডাক্তারের কাছে ছুটতে হয়েছে সব কিছু জানায় নমিতা। সাথে এও জানায় সমস্ত ব্যাপার স্যাপারে সে এত পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছে যে আর পারছে না। শেষে অভিমানের স্বরে বলে, সে বাপের বাড়ি চলে যাবে।

বর্ষার প্রারম্ভে প্রকৃতির মাঝে একটা গুমোট ভাব থাকে, একটা অস্বস্তিকর গরম শরীর ও মনের শান্তি নষ্ট করে। কিন্তু বৃষ্টি নামলেই সব উধাও। তখন প্রকৃতির মাঝে যেমন স্নিগ্ধতা বিরাজ করে তেমন মানুষের দেহ-মনেও তা সঞ্চারিত হয়। সুমন্তের মনে হয়, নমিতার সঙ্গে প্রকৃতির একটা মিল আছে। শুধু নমিতা কেন সমস্ত নারীই যেন প্রকৃতির মত। তাদের মধ্যে যেমন রুক্ষতা আছে, তেমন স্নিগ্ধতাও আছে। প্রকৃতি ও নারী এই দুই নিয়েই যেন পরিপূর্ণ।

নারী চরিত্রের বিশেষ গুণ খুব তাড়াতাড়ি তারা নরম হয়ে যায়। এই জন্যই হয়তো সুমন্তের সংসার টিকে আছে এখনও। দশ বছরের সংসার জীবনে কত বার যে নমিতার থেকে মুক্তির কথা ভেবেছে সুমন্ত তার হিসেব নেই। কিন্তু পারেনি এই নমিতার জন্যই।

পাশের ঘরে ছেলে ঘুমোচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি উঠে যায় সুমন্ত। ছেলের ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙুলটি কেটেছে। হাতটা নিজের বাম হাতে নিয়ে ব্যান্ডেজের উপর ডান

হাত বোলাতে বোলাতে নমিতার দিকে তাকিয়ে বলে, ছেলে কে ওঘরে যেতে দিয়েছ কেন?

—ছেলেকে তো আর সব সময় আঁচলে বেঁধে রাখতে পারি না। সংসারের কাজ করতে করতেই সারাদিন চলে যায়। তোমাকে বলছি একটা কাজের মেয়ে রাখতে, সেটাও রাখছো না।

সুমন্ত বলে, কাজের মেয়ে পাওয়া অত সহজ নয়। কেউই এখন আর কাজ করতে চাই না, বস্তির ছোটো লোকগুলোর হাতে এখন প্রচুর টাকা। কেউ কেউ কাজ করতে চাইছে, কিন্তু তাদের ডিমান্ড প্রচুর। দু হাজার টাকা তার সঙ্গে দুবেলা খাওয়া, পুজোতে শাড়ি। আমি আঠারো শ দেব বলে এসেছি।

সে তো ঠিক আছে, কিন্তু ওই ঘরটার জিনিসগুলো বিক্রি করলে না। কত বার বলেছি এসব জিনিস বিক্রি করে দাও, বিক্রি করে দিলে আজ আমার ছেলের হাত কাটতো না।

'দেখছি' বলে সুমন্ত পাশের ঘরে চলে যায়।

কয়েক দিন পর এক রবিবার দুপুর নাগাদ সুমন্ত খেতে বসেছে। সে সময় কলিং বেল বেজে ওঠে। নমিতা শ্যামলী নামের নতুন কাজের মেয়েটিকে উচ্চস্বরে ডেকে বলে,— নিচে গিয়ে দেখতো কে এসেছে।

শ্যামলী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে নমিতার পাঁচ বছরের ছেলে 'আমিও যাব' বলে বায়না করে। নমিতা ছেলেকে ভয় দেখায়, বলে— 'তুমি যাবে আর তোমাকে একটা ছেলে ধরা ধরে নিয়ে চলে যাক!'

সুমন্ত বৌয়ের কথার রেস ধরে বলে,— পাড়ায় পাড়ায় ছেলে ধরা ঘুরছে, তুমি মোবাইলে দেখনি?ছেলেটি ভয় পেয়ে আবার চেয়ারে উঠে বসে। এর মাঝে শ্যামলী সে জানায় একজন পুরনো বই খাতা, লোহা লক্কড় কেনার লোক এসেছে।

সুমন্ত বলে, ও আচ্ছা, আমিই অরুণকে ডেকেছিলাম। ওকে গিয়ে বল একটু অপেক্ষা করতে, বল কি দাদা খেয়ে আসছে।

মিনিট পঁচিশ ত্রিশ পর সুমন্ত ও নমিতা তার ছেলেকে নিয়ে নীচে নেমে আসে। নীচে প্রশস্ত বারান্দা। দুটো ঘর, তারই একটাতে পুরনো বই খাতা, খবরের কাগজ, পুরনো লোহা, কাঁচের বোতল, প্লাস্টিকের জার, বোতল ইত্যাদি অব্যবহার্য সামগ্রীতে পূর্ণ। শ্যামলী সব বের করে দিচ্ছে আর অরুণ আলাদা আলাদা ভাবে সব ওজন করে একটা ছোট্ট খাতায় সুমন্তকে জানিয়ে নোট করছে।

ঘন্টা খানেক এভাবেই চলছে। অরুণের প্রচন্ড জল তেষ্টা পেলে সুমন্তের ছেলেকে হেসে বলে, 'বাবা একটু জল আনতে পারবে?'

সুমন্ত চিড়বিড় করে ওঠে, 'তোরা পারিস বটে, বাচ্চা ছেলের কাছে জল চাইছিস! আর এইটুকু সময়ের মধ্যেই তেষ্টা পেয়ে গেল!'

নমিতা বলে,— ছাড় না। শ্যামলীকে ডেকে বলে,— এক বোতল জল নিয়ে আয় তো শ্যামলী। আর দেখিস ভাল বোতলগুলো যেন নিয়ে আসিস না। পুরানোগুলো একটা নিয়ে আসবি।

অরুণের একটা কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। সে কিছু না বলে বাকি জিনিস গুলো ওজন করতে শুরু করে।

পাঁচ ছ' দিন পর সুমন্ত দুপুরের মধ্যেই অফিস থেকে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ফেরে। কলিং বেলের শব্দে শ্যামলী রান্না ঘরের হাতের কাজ ফেলে এসে দরজা খুলে একটু অবাকই হয়। এত তাড়াতাড়ি দাদা কখনও বাড়ি ফেরে না। তার উপর সুমন্তের শরীর ঘামে ভেজা, চুল উসকোখুসকো, চোখ প্রচন্ড লাল। শ্যামলী ভয় পায়। হয়তো সুমন্তের শরীরটা খুবই খারাপ। হঠাৎ হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসেছে।

'দাদা আপনি ঘরে গিয়ে বসেন আমি জল দিচ্ছি'।

'তোর কাছে জল কে চেয়েছে? যা ভাগ, নিজের কাজ গিয়ে কর' বলে ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। ঘরে ব্যাগ রেখে দ্রুত বেরিয়ে নিচে চলে গেল। যে ঘরে বই খাতা লোহা লক্কড় রাখা ছিল, তারই এক কোণে একটা কাঠের আলমারি ছিলো। সেটা খুলে ভাল ভাবে সুমন্ত কী খুঁজতে থাকে। কিছু বই পত্র এখনো আছে, ভাল আছে বলে সেগুলো সুমন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছিল। কিছু ডায়ারিও আছে, সুমন্তের অনেক তথ্য

ও স্মৃতি সেগুলোতে লিপিবদ্ধ আছে বলে সেগুলোও বেঁচে গেছে। আর আছে তাদের বাবুর পুরনো খেলনাপাতি। বই, ডায়ারি এমনকি খেলনাপাতিগুলোও সরিয়ে সুমন্ত কী খুঁজতে থাকে। না পেয়ে বিরক্তি সহকারে পাল্লা দুটি সজোরে বন্ধ করে ঘরের আনাচে কানাচে দেখতে থাকে। ফাঁকা ঘরে সুমন্ত তার জিনিসটি না দেখতে পেয়ে ছুটে উপরে উঠে যায়।

'শ্যামলী, শ্যামলী' – সুমন্তের উচ্চ স্বরে শ্যামলী এক রকম ছুটেই আসে। কী হয়েছে জানতে চাওয়ার আগেই সুমন্ত বলে ওঠে, –একটা দলিল দেখেছিস? নিচের ঘরে আলমারিতে ছিল।

'না দাদা, আমি দেখিনি।**'**

সুমন্তের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, দলিলটা পুরনো জিনিস পত্র বিক্রি করার সময়ই কাগজের মধ্যে চলে গিয়েছে।

ওই অবস্থাতেই সুমন্ত বেরিয়ে পড়ে। বের হওয়ার আগে শ্যামলীর হাতে দুটো পাঁচশো টাকা দিয়ে বলে, **'**তোর দিদি বাবুকে নিয়ে ফিরলে এই টাকাটা দিস। বিকেলে সুজয় উকিল একজনকে পাঠাবে টাকাটা যেন তার হাতে দেয়। কীসের টাকা জানতে চাইলে বলবি বাজারের জমিটা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে। আমি ফিরে এসে ওকে সব জানাব।**'**

এমনিতেই সুমন্ত ঘেমে একাকার হয়ে ছিল। তার উপর বাইরে বের হতেই আরো অস্বস্তি বেড়ে গেলো। মাথার উপরে সূর্য যেন প্রতিহিংসা বশত তার সমস্ত তেজ ঢেলে দিচ্ছে। সুমন্ত একটি রিকশা ডেকে নেয়। রিকশাওয়ালাকে ঠিকানা বলে দিয়ে চোখ বন্ধ করে বসে সুমন্ত।

রিকশার ছাউনিতে যেন কিছুটা আরাম বোধ হয়। কখন যে সুমন্তের চোখ বুজে এসেছে বুঝতে পারে নি। **'**দাদা নামুন, চলে এসেছি**'** রিকশাওয়ালার ডাকে জেগে ওঠে সুমন্ত। ভাড়া দিয়ে অরুণের বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। অরুণের কাছে শুনেছিল বট গাছের পাশ দিয়ে যে গলিটা গেছে তার দু তিন শো মিটার ভেতরে তার বাড়ি। একজন বয়স্ক লোককে অরুণের বাড়ির কথা বললে সে দেখিয়ে দেয়।

একটা খাপা দেওয়া বাড়ি, তারও এখানে ওখানে তালি দেওয়া। কোথাও পলেথিন লাগানো তো কোথাও পুরনো জং ধরা টিনের টুকরো আটকানো। বাড়ির উঠোনে একটা নিমগাছ। নিম গাছের ছায়ায় তার ছেলের সমবয়সী একটা ছেলে খেলা করছে। সুমন্ত ছেলেটিকে ডেকে বলে, **'**এই ছোঁড়া, তোর বাবার নাম অরুণ?'

ছেলেটি মাথা নেড়ে জানায় যে অরুণ তার বাবা। সুমন্ত বলে, **'**তোর বাবাকে ডেকে দে তাড়াতাড়ি**'**।

'বাবা নেই, মাকে ডেকে দেব**'** বলেই তার মাকে ডাক দেয়।

বাড়ির ভেতর থেকে একটি মহিলা বেরিয়ে আসে। **'**কী হয়েছে রে আকাশ**'** বলেই সুমন্তের দিকে চোখ পড়ে।

মহিলার পরিচয় বুঝতে পেরে সুমন্ত বলে,– অরুণ কোথায়?

'ও তো সকালে মাল কিনতে বেরিয়েছে।**'**

'কখন ফিরবে?**'**

'গরমের সময় সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, ফিরে স্নান করে দুপুরে বাড়িতেই খায়। আপনি একটু বসুন, আমি ফোন করেছিলাম, চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।**'**

'তুমি আর একটা ফোন কর, একটু তাড়াতাড়ি আসতে বল।**'**

'আচ্ছা**'** বলে মহিলাটি ঘরে চলে গেলো। এক হাতে একটি ফোন অন্য হাতে একটি চেয়ার নিয়ে বেরিয়ে এল। **'**বসুন দাদা**'** বলে চেয়ারটি সুমন্তের দিকে এগিয়ে দেয়। তারপর অরুণকে ফোন করে জানায় যে তার জন্য একজন অপেক্ষা করছে, সে যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসে।

ফোন রাখার পর সুমন্তকে জানায় যে অরুণ দশ মিনিটের মধ্যেই চলে আসছে। সুমন্তের ঘামে ভেজা শরীর দেখে বলে, **'**আপনি তো একে বারে ঘামে ভিজে গেছেন। চোখে মুখে একটু জল দিয়ে নিন।**'**

পাশেই টিউবওয়েল ছিল। সুমন্ত উঠে গিয়ে ভাল করে হাত মুখ ধুয়ে চেয়ারে এসে আবার বসে। পকেট থেকে রুমাল বের করতে যাচ্ছিল সুমন্ত, বাচ্চা ছেলেটা একটা

গামছা এনে বলে, 'কাকু এই গামছাটা মা দিল হাত মুখ মোছার জন্য।'

এতক্ষণে সুমন্তের মধ্যে একটা প্রশান্তি এসেছে। হাত মুখ ধুয়ে আর নিম গাছের ছায়ায় অনেক ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে বাচ্চা ছেলেটির হাত দিয়ে একখানা হাত পাখাও পাঠিয়েছে মহিলাটি। তার পর নিজে একটা ট্রেতে একটা কাঁচের গ্লাসে লেবুর শরবত ও একটা জগে সাদা জল নিয়ে উপস্থিত। সুমন্ত কোনো কিছু না বলে ট্রে থেকে জগটা নিয়ে পরম সুধার মতো জল গলায় ঢালতে থাকে।

জল পান করার পর সব নিয়ে যেতে বললে মহিলাটি বলে, 'দাদা শরবত টা খান, অনেক ভাল লাগবে।'

মহিলাটির আন্তরিকতাকে সুমন্ত উপেক্ষা করতে পারে না। গ্লাসটা মুখে লাগাতেই সুমন্তের মনে হয় যেন অমৃত পান করছে। শরবত পান করার পর যেন তার শরীরের যাবতীয় ক্লান্তি উধাও।

কিছুক্ষণ পরই অরুণ তার মাল বওয়ার সাইকেলটা নিয়ে উপস্থিত হয়। সুমন্তকে দেখা মাত্র বলে, 'দাদা কী ব্যাপার, আবার কী বিক্রি করবেন।'

নিম গাছে তার সাইকেলটা ঠেস দিয়ে 'মায়া' বলে তার স্ত্রীকে ডাক দেয়। সে ডাকের মাঝে এক গভীর মাধুর্য সুমন্ত লক্ষ্য করে। এত ক্লান্তির পর এত মাধুর্য কী করে আসে তা বুঝতে পারে না সে।

'তোমার কেনা বই খাতার মাঝে আমার একটা দলিল চলে এসেছে।'

মায়া একটা চেয়ার নিয়ে এসে দেয় অরুণকে তাতে বসতে বসতে অরুণ বলে, না দাদা, কাগজ পত্রের মধ্যে তেমন কিছু ছিল না। আমি আর আমার বউ সেগুলো নামিয়ে সাজিয়েছি, কই তেমন কাগজ দেখিনি।

'দেখ ভাই দলিলটা আমার খুব দরকার, তা না হলে আমার অনেক ঝামেলা হবে।'

মায়া অরুণের জন্য শরবত নিয়ে আসে সাথে জল। অরুণকে বলে, 'আমাদেরও তো দেখার ভুল হতে পারে। চোখে মুখে জল দিয়ে নাও। দাদার জন্য চা করেছি চা খেয়ে একবার জিনিস গুলো উল্টে পালটে দেখ। পরে স্নান করে ভাত খেও।'

অরুণ ও সুমন্ত চা খেয়ে বাড়ির পেছন দিকে যায়। সেখানে তার সারা মাসের মাল জড়ো করা থাকে, মাস শেষে সেগুলো বিক্রি করে। বৃষ্টিতে যাতে না ভেজে তাই উপরে ত্রিপলের ছাউনি। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের মাল আলাদা আলাদা ভাবে জড়ো করা আছে। তার মধ্যে একটা ভাল জায়গায় বাঁশের মাচার উপর প্রচুর বই খাতা খবরের কাগজ পরিপাটি করে সাজানো। মায়া সেখান থেকে কিছু কিছু করে বের করে দেয় আর অরুণ উল্টে পালটে দেখে। সুমন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভালো ভাবে দৃষ্টি দেয়, কোনো ভাবে যেন মিসিং না হয়ে যায়।

পাশে অরুণের ছেলে আপন মনে খেলছিল। মায়া তাকে ডাক দিয়ে বলে,– আকাশ, কাকুকে একটা চেয়ার এনে দে তো।

আকাশ ছুটে গিয়ে একটা চেয়ার এনে দেয়। সুমন্ত তাতে বসে বসে সব পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। প্রায় ঘন্টা খানেক পর সুমন্তের একটা ফোন আসে। নমিতার ফোন। স্কুল থেকে ছেলেকে নিয়ে ফেরার পর শ্যামলীর কাছে সব শুনে ফোন করে।

ফোনের ওপাশ থেকে নমিতা বলে, 'তুমি নাকি দলিল খুঁজতে ওই ভাঙড়িওয়ালার ওখানে গেছ। ওটা আমি আগেই সরিয়ে রেখেছি। ভুল করে কাগজ পত্রের মধ্যে ওগুলো চলে গেলে ছোটো লোকগুলো কি সহজে ফেরত দেবে? নানা রকম ভাবে প্যাঁচে ফেলে চার-পাঁচশ ধান্দার চেষ্টা করবে।'

সুমন্তের মুখে আঁধার নামে। 'এখন রাখ' বলে নিজেই ফোনটা কেটে দেয়।

একটি খুন

সুকৃতি

সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই। ট্রেনে ঠাসা ভিড়। আব্দুল হারানের পায়ের গতি ক্রমেই শ্লথ হচ্ছিল। হুড়োহুড়ির মাঝে ভিড়ের গতিতে একপ্রকার বিনা বল প্রয়োগেই ট্রেনে উঠে পড়েছেন যে কখন প্রায় টেরই পাননি। বয়স বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি। লম্বা , ফরসা গোলমুখে খোঁচানো গোঁফ, পরনে সাদা পাঞ্জাবি। মুখে ক্লান্তির থেকে চিন্তার ছাপ বেশি।

তপ্ত রোদের ঝালাস বাতাসে বেশ টাটকা তখনো। সৌভাগ্যক্রমে জানালার ধারে সিটটা পাওয়া গেলেও, একফোঁটা স্বস্তি পেলেন না হারানবাবু। বামে-ডানে, সামনে উপরে কোথাও একচিলতে ফাঁক নেই। জাঁকিয়ে বসা দু-পেয়েগুলোর তপ্তশ্বাসে, ফ্যানের হাওয়াটাকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে রাজত্ব তৈরি করেছে, গরম হাওয়া কথা বলছে। কিরে, হারান নাকি, অন্ধকারে কী দেখিস?

জানালা দিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকা মানুষটা চেনাজনের গলা শুনে হাসি আনার চেষ্টা করলেন ।

– তাহলে বন্ধু এখন কী করছিস? কেমন আছিস?

এই-এই তো।

সমবয়সী এই বন্ধুর এতগুলো কথার ধাক্কা হারানবাবু ঠিক নিতে পারলেন না। একটু চুপ করে সেই হাসিমুখে চেয়ে রইলেন।

সেই যে, বিশ বিঘা জমি, দুই বিঘা বিক্রি করলাম (হেসে), আমার ছেলে, তোর মনে পড়ছে, নন্দন রে,– বিএসসি, এমএসসি সবই করল, শেষে Executive Assistant এর চাকরি হল।

আবার চোখ টিপে হেসে– শুধু ওই দুবিঘে জমিই মাইনাস করলাম। ভিতর থেকে আসা একটা আনন্দে সতীনাথবাবু হো-হো-হো করে হেসে উঠলেন। হারানবাবুও তাতে মিথ্যে যোগ দিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে কেশে ফেললেন।

–আচ্ছা বল, কোথা থেকে আসছিস?

– বিমা অফিসে গেছিলাম। কিছু লাভ হল নারে।

– হ্যাঁ, হবে হবে। টাকা, আমিও পাই, রেগুলারই পাই। ওই নেতাদের পেছন পেছন অনেক ঘুরে ঘুরে..।

পাশ থেকে চল্লিশোর্ধ এক খিটখিটে চাষিভাই যোগ দিলেন– আমরা যারা ছোট চাষি, ফসল বিমার প্রিমিয়াম আমাদের কাছে বেশ বেশিই ঠেকে। লাভের গুঁড় পিঁপড়েকে দিয়ে দেওয়ার মত। কাজেই অনেকেই ওই বিমা করেনা, যারাও বা করে, বিপদের দিনে টাকা পায়না– এই-ই আমাদের অভিজ্ঞতা। সয়েও গেছে।

কথাটা তীরের মত বিঁধল হারানবাবুর বুকে। কথাটা তার জন্য যে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যাওয়া মানুষটার বুকটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল।

রামনগর জেলার পনেরোটি তালুকের একটি নিশ্চিন্তপুর। বাদাম-কাপাস-আখ-জোয়ার-বাজরা ক্রমে ক্রমে ফাঁকা বিস্তীর্ণ মাঠে আসে যায়। বেশিরভাগ ফ্যামিলিরই রুজি রোজগারের উৎস তাদের বংশানুক্রমে চলে আসা জমি। এমনই বিঘা চারেক একটানা ক্ষেতের মালিক হারানবাবু। জমিতে পোঁতা বাদাম আর কাপাস জলের অভাবে জ্বলে ছাই। মাস দেড়েক আগেই চাষের খেত এভাবে শ্মশানে পরিণত হয়েছে।

ট্রেনের হ্যাঙ্গারে ঝুলছে অসংখ্য। কেউ কেউ হয় তো একটু বসতে পাওয়াকে ভাগ্যের কথা বলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। হারানবাবুর ভাগ্য কিন্তু সুতোয় ঝুলছে। বাজারে ততদিনে লাখ তিনেক টাকা দেনা। ভেবেছিলেন, ফসল উঠলে কিছু অন্তত শোধ দিতে পারবেন, কিন্তু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই, তপ্ত মরুভূমি, হারানবাবুর বুক চিরে রস শুষে নিচ্ছে, বাকিটুকু ঘাম হয়ে কপালে, নাকের ডগায়, কানের পাশ দিয়ে বয়ে

বুকে শেলের আঘাত হানছে।

কয়েকদিন পর।

প্রায় শুকিয়ে যাওয়া বিলের মাছগুলো যেমন একবার জলে আর একবার ডাঙায় খাপি খায়, বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে হারানবাবু সেভাবেই কাটালেন।

চোখের চাহনি অসহায়, অনাথের মত হারানবাবু কোনও রকমে তাঁর স্বপ্নের কাপাস-বাদামের আলে নিজের দেহটাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন– বিমা অফিস থেকে স্যুট-কোট পরিহিত জনা চারেক ব্যক্তি খেতে ভালোভাবে চোখ বোলাচ্ছেন। হারানবাবু ঠিক বুঝতে পারছিলেন না,– হয়তো আতস কাঁচ দিয়েই কী সব পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছিল। ক্ষেতের চার-ছয় জায়গা থেকে কিছুটা করে মাটি একটি ব্যাগে পুরে নিয়ে গেলেন তাঁরা।

পরের দিন হারানবাবু অনেক অপেক্ষার পর অফিসারের নজর কাড়তে পারলেন।

–বাবু, আমি হারান মিস্ত্রি। আমার জমি থেকে যে মাটি আনা হল, কিছু বুঝলেন?

হারানবাবুর বিনয়ী কথার সুরে, হয়তো অফিসার দুর্বলকে খোঁচা দেবার আনন্দটুকু ভালো ভাবেই পেতে চাইলেন। চশমার ফাঁক দিয়ে উপরে চোখ তুলে অফিসার বললেন– আপনি কি জমিতে বীজ পুঁতেছিলেন?

বীজ পুঁতেননি তো ফসল কোত্থেকে আসবে হে মশাই? এই ব্যঙ্গের খোঁচায় হারানবাবুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল, এপ্রিলের ঝলমলে দিনটাতে একটু আবছা দেখতে লাগলেন।

থরথর পায়ে বাড়ি ঢোকার সময় হারানবাবু হাসির রোল শুনতে পেলেন, তাই ভেতরে না গিয়ে বৈঠকের চেয়ারটায় গিয়ে বসলেন। স্বস্তি না পেয়ে এদিক ওদিক পায়চারি শুরু করলেন।

হারানবাবুর দুই মেয়ে আশা (১২) ও আলো (৯)। আর একমাত্র ছেলে অনিমেষ (১৭)। হাসির আওয়াজে, ভেসে আসা কথার আভাসে স্পষ্টই বুঝলেন, অনিমেষের উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরিয়েছে। রেজাল্ট দুর্দান্ত।

কয়েকদিন নিজেকে মৃত বলে মনে হচ্ছিল, ছেলের রেজাল্টটুকু একটি আশা এনেছিল, তাও মাঝপথে থমকে যাওয়ার মত। স্ত্রী-মেয়ে-ছেলের ভবিষ্যৎ শুষ্ক মরুভূমির কড়া রৌদ্রতপ্ত রাজপথে– ভাবনা সীমানা পেরিয়ে কোথাও মিলবার প্রান্তর খুঁজে পায়না, কাপাসের শুকনো শ্মশানে বিলীন হয়ে যায়।

এটা শুধুমাত্র হারানবাবুর পরিবারের গল্পই নয়। নিজগ্রাম ও প্রতিবেশী তিনগ্রামের মোট প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ কৃষক ঘরের ছবিটা বিচিত্র হলেও দুর্দশায় একই বিন্দুতে মিলেছে।

সড়কের ধারে দুবড়া ঘাসের উপর বসে হারানবাবু ও আর কয়েকজন কৃষকবন্ধু। থমথমে ভাব কাটিয়ে যাদব পারুই বললেন– নগেন ভাই, দেবীপুর তালুকে পাঁচজন কৃষক আত্মহত্যা করেছে গতমাসে, আমাদের ও বুঝি সে সময় এসেছে!

– সরকারের কী আসে যায়?

– আমাদের ভাল হওয়ার আর কী বাকী আছে?

– অথচ, এই ছবিটাই একদিন সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। বছরে দশ পনেরো লাখ টাকা লাভ ছিল। এখন ফসল গড়তে খরচের পর খরচ, ফসল উঠলে দাম পড়ে যায়। ঘরে নুন আনতে পান্তা ফুরোই অবস্থা।

রজনীকান্তবাবু একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন– একে তো সার কীটনাশকের দাম বেড়েছে গত কবছরে তার উপর বৃষ্টি নেই, সেচের জল মেলেনা, সব ফসল কাঠ হয়ে গেল গো। একটা হিপানো কান্না চেপে নিলেন রজনীবাবু।

কৃষকের অধিকার নিয়ে কাজ করা দিলু ভাই বললেন,– নিজেদের ইচ্ছেমত তালুককে খরা কবলিত বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বাইরে তো হাজারো গ্রাম। তার কী হবে? কৃষক সহায়তার কোনও নমুনা নেই।

এরকম হা হুতাশ ভরা কথা হারানবাবুকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, ভাবা যায় তাতে আবার যোগ দিল কৃষক নেতা দিলু...! ক্ষুদ্র সভ্যগণের উদ্দেশ্যে খোঁচা দিয়ে বললেন হারান মিঞা– তো, এসব বলে শুনে কী লাভ হে? আমাদের করণীয় কি কিছুই নেই? প্রতিদিন এদিক ওদিক থেকে তাগাদার কঠিন কণ্ঠস্বর। আমরা আঁধারে আছি, আরও কি আঁধারেই ডুবে যাব?

দিলুভাইয়ের মুখটা কাচুমাচু। দ্বিতীয়বার আবারো থমথমে ভাব। একটা চিল মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, তারপর চাতক পাখির চিৎকারে বারি চাওয়ার আর্তস্বর সবার কাছে স্পষ্ট হল, কিন্তু নিজেদের আগামী কালের পদক্ষেপ কী হবে..... একটা কথাও ফুটল না। অন্ধকার হয়ে এসেছে, যে যার নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল।

নিশ্চিন্তপুরে অনিশ্চয়তার কালোমেঘ ঘনীভূত। কাজ না থাকায় অফুরন্ত সময়। বিশেষ করে চাষিদের পায়ের ব্যস্ততা বেড়েছে শতগুণ। নগেনবাবু আর যাদববাবু দুজনে ফিসফিস করতে করতে চড়া রোদে হারানবাবুর বাড়ির দিকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটছিল। সদর দরজার কাছে এসে হারানদা ডাক দিতেই, হাসফাঁস করতে করতে বেরিয়ে এলেন হারানবাবু। সাধ্যাতীত গতিতে পাঞ্জাবিতে হাত ঢোকাতে ঢোকাতে অভ্যাগতদের সাথে পা মিলিয়ে হারান বাবু জোর কদমে এগোতে লাগলেন। অনিমেষের কেমন একটা খটকা লাগল। আর্থিক অনটনে তার বাবার দেহের সৌন্দর্য ও শক্তি ঝরে পড়ছে একটু একটু করে। অনিমেষের মা সুমিতাদেবী হাঁ করে চেয়ে রইলেন। এই কদিন আগেই নগেনবাবুর সাথে তার স্বামীর চরম বাকবিতণ্ডা হয়– জমি ফসল সার এটা ওটা নিয়েই বোধ হয়। তবু না তার সঙ্গেই এত ভাবের সাথে চললেনটা কোথায়? তাছাড়া কদিন থেকেই যেন উনি একটু ঘোরের মধ্যে যাচ্ছেন, কী যে ভাবেন, মাঝে মাঝে কথার কোনো উত্তর পাওয়া যায়না।

আরও কয়েকদিন অতিক্রান্ত। বাবার গতিবিধি কেমন একটু অন্যরকম ঠেকছিল অনিমেষ এর। আজ একটা সুযোগ এসেছে মা জলখাবার করতে ব্যস্ত। আশা-আলো স্কুলে। ঘরে যে আস্ত গোল টেবিল বৈঠক। বন্ধ জানালায় কান পেতে রইল অনিমেষ। একজন বললেন – তাহলে নগেনবাবু আপনি শ্যামাপদকে নিয়ে পশ্চিমের দেবীপুরে চলে যান, সেখানে ঘুরে ঘুরে শুধু চাষি না, ঘরে ঘরে সবাইকে বোঝাতে হবে, আমাদের মত বিপন্ন অসহায়দের কথা। পরক্ষণেই আরেকজনের গলা– অন্তত, অভিভাবকগুলোকে নিজেদের আওতায় আনতে হবে, নিজেদের ফ্যামিলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেই, ব্যস।

– এবারে আমাদের ভোট বয়কটের দিন এসেছে, ভোটের বাজারে তেনাদের খালি কয়েকটা গুরুগম্ভীর কথার মারপ্যাঁচ। বীমা মেলে না, সেচ মেলে না,... চিকিৎসা নেই শুধুই নেই ভাই বেঁচে থাকতে হলে একটা চেষ্টা তো নিতেই হবে, এভাবে হাহুতাশ করে তো মরে যেতে পারিনা।

– (এটাতো বাবার গলা), অনিমেষ অবাক হয়ে যায়।

আমরা অসহায়, আমাদের ছেলেমেয়েরা বিপদের পথিক। অসহ্য! অসহ্য! দিন বিশেক থেকে বাবার শরীরটা যে খুব খারাপ যাচ্ছে তা অনিমেষ টের পেয়েছে ভালোভাবেই। এত দুর্বল শরীরে এত তরতাজা উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অনিমেষ ভাবিত হল, একটা রূঢ় ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তার হৃদয় কেঁপে উঠল। বাবা কী করতে চাইছে? ঘরে দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকানোর কী plan যে চলল সবটা শোনা অসম্পূর্ণই থেকে গেল অনিমেষের।

পরেরদিন সকালে হারানবাবু অত্যাধিক নিষ্ঠাভরে কী সব লেখালেখি করছিলেন, অনিমেষ ঘরে ঢুকল। তিনি না তাকিয়েই বললেন, কিরে অনি, কোন কলেজে ভর্তি হবি বাবা, কিছু ঠিক করলি? বাবার কাছে বসে, - না, ঠিক করিনি। তবে কৃষিবিজ্ঞান নিয়েই পড়ার মনস্থির করেছি।

বাবাকে শান্তনা দেওয়ার মত কথা বলার সাহস অনিমেষের হল না। সে ঝড়ের গতিতে বলে ফেলল- আমি টিউশন পড়াচ্ছি, ভর্তির টাকা জোগাড় হয়ে যাবে।

বলার ভাবটা বাচ্চার ন্যায় ছিল বটে, তবু কথাটা পরিণতের মতই শোনালো।

হারানবাবু ছেলের পিঠে একটা আলতো চাপড় দিয়ে একটু হাসলেন।

ভোটের প্রচার আর বিজ্ঞাপন চলেছে রমরম করে। পাড়ার বাবলু-হাবলু রাম শ্যামের থেকে অনিমেষ প্রায়ই শুনছে-মাঝে মাঝেই ঝকঝকে তকতকে প্রকাণ্ড গাড়ি এসে থামছে। সে নিজেও আড়াল থেকে দেখেছে সন্ধ্যেবেলা উমাপিসির বাড়ির আঙিনায় প্যান্টস্যুট পরা জনা সাতেক লম্বা, তাবড় তাবড় যুবক। হাতে রহস্যজনক ব্যাগ। অনিমেষের চোখ তো একে বারে কপালে উঠল- একী? ব্যাগে সাজানো থরে থরে টাকার প্যাকেট। বেছে বেছে, ওয়ার্ড নম্বর দেখে উমা পিসির হাতে দিতেই পিসি পিছু হটল। - না গো বাছা, ও আমরা ছোঁবনা। এতে কদিনই বা চলবে। এসব হাতে নিলে, সংসার হারা হব, তার হুকুম। অদ্ভুত। তা হলেও, এসবই, নাকি এবার ঘটছে। যেমন ভারী ব্যাগ নিয়ে ঢুকছেন, তেমন ভারী ব্যাগ নিয়েই বিদায় হতে হচ্ছে। ভোটের মরসুমে রাজনৈতিক নেতার চ্যালাদের মুখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা, চোখ চাওয়া চাহনি।

ভোটের আগের দিন রাত্রে, অনিমেষ, বারান্দার একটা কোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল। হারানবাবু কাউকে উদ্দেশ্য করে বলছিলেন- এসব নেতা কেতাদের টিকিটা পর্যন্ত দেখতে পেলাম না একদিন আগে পর্যন্ত, বিমার টাকাটা কোনওভাবে জোগাড় করা গেল না। এখন দিব্যি, কাপড় জামা, টাকা, মাছ-মাংস নিয়ে দোরে দোরে ঘুরছে, মর ব্যাটারা। টলতে টলতে ঘরে ঢুকলেন হারানবাবু।

কেবল ভোরের আলো ফুটেছে। পাড়ার মনিকাদেবী হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল, ঝপাৎ করে দরজার শিকলিটা খুলেই চিৎকার করে ডাক দিল,— অ নার মা, কোথায় তুই পোড়ারমুখী! হারানভাই শে-ষ—

সুমিতাদেবী বিছানা ছেড়ে খুঁটি ধরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। শোনা মাত্রই অনিমেষের হৃদয় ভেঙে চুরে খানখান। ঘর থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দিল ছুট। বুকভরা শূন্যতা নিয়ে যখন সে খেতের ধার ঘেঁষে শেষ প্রান্তে পৌঁছাল, দেখল খেতের পাশের ইলেকট্রিক পোস্টে ঝুলছে বাবার দেহ। যে জমিতে ফসল ফলিয়ে, হারানবাবু স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন সন্তানদের, সেই জমির বুকে তিনি হারিয়ে গেলেন, সকলকে সর্বস্বান্ত করে।

ছমাস হল। ভোটে কে জানি কে জিতেছে, রাজনৈতিক কচকচানির ধার ধারেনা আশা আলোরা। ভাড়া বাড়ির ঘুপচিতে খাটিয়ায় বসে সুমিতা দেবী শাড়ির খুঁটে চোখ মুছছেন— আতব চুলোয় জ্বাল দিতে দিতে। আশার ছোট চায়ের দোকান— পাটকাঠির ছোট্ট ছাউনি, একটা ভাঙা বেঞ্চ, বিস্কুটের কয়েকটা ভাঙা বোয়্যাম।

লেটার মার্কস পেয়েছে অনিমেষ। সমস্ত দুঃখকে পাঁজরের ভেতর সামলে নিয়ে কোনও রকমে শান্তিপ্রিয় এগ্রিকালচারাল কলেজে ভর্তি হয়েছে। হোস্টেলে যাওয়ার জন্য সমস্ত জোগাড় তৈরি। ওখানে গিয়ে টিউশনি করে যেভাবেই হোক নিজের লক্ষ্যে পৌঁছাতেই হবে... এই আত্মবিশ্বাস নিয়েই এই দুমাস ভবিষ্যৎ লক্ষ্যের জাল বুনে চলেছে। স্টেশনে পৌঁছেই অনিমেষ নির্নিমেষ চক্ষে দেনার দায়ে বিলিয়ে যাওয়া জমিটার দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ চাপা আবেগ তাকে তোলপাড় করে তুলল, ট্রেনের হুইসল বেজে গেছে, লাইনে রেড সিগন্যাল। হাতের ব্যাগ পিঠে তুলে, সেই ইলেকট্রিক পোস্টের দিকে জোরে জোরে দৌড়াতে আরম্ভ করল।

আবর্তন

তানিয়া খাতুন

তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধ্যা দেওয়ার জন্য রোমানা বৌমার ঘরের সামনে এগিয়ে গেল। রোজকার মতো আজও তিতিনের কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে। ওর মা ওকে পড়াতে বসেছে বোঝাই যাচ্ছে, তিতিনের জেদের কাছে ওর মায়ের সব চেষ্টা ব্যর্থ।

–বৌমা, ছেলেটাকে ওভাবে মেরো না। আয় তিতিন, কাছে আয় দেখি। আমি বলছি, মা আর মারবে না।

–মা, আপনি ওকে আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় চড়িয়েছেন, একটা কথা শোনে না। অবাধ্য ছেলে।

–অতটুকু ছেলে। কীই বা বুদ্ধি হয়েছে ওর। বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

– না মা, এখন থেকে লাগাম না ধরলে কিচ্ছু ঠিক হবে না। আপনি আপনার ছেলের ক্ষেত্রে যে ভুল করেছেন সেটা আমি আমার ছেলের ক্ষেত্রে করতে চাই না।

সন্ধ্যার পর থেকে রোমানার মনটা খারাপ। রাতের খাবার খাওয়ার জন্য যতীন মাকে ডাকতে এসেছিল। রোমানা 'পা ফুলেছে, রাতে আর খাচ্ছি না' বলে এড়িয়ে গেছে। আসলে সে ছেলে বৌমার মুখোমুখি হতে চাইছে না। খেতে বসে এটা ওটা নিয়ে যে কথাই উঠুক না কেন বৌমা যতীনকে কেমন খোঁচা মেরে কথা বলে। এইতো সেদিন খেতে বসে রোমানা যতীনকে বলল, তার দিদির বাড়ি যেতে। যতীনের একমাত্র ভাগ্নির জন্মদিন উপলক্ষ্যে দিদি তার ভাই আর ভাই এর বউকে নেমতন্ত করেছে। একথা শুনে বৌমা বলে উঠল তোমরা যেও, আমি যাব না। যতীনের 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, আমার কটা বেনারসী জামদানি আছে বলো ? কী পরে যাব, যে সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরোয় তাদের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে যাওয়া বিলাসিতা ছাড়া কিছুই না।

বৌমার এ অভিযোগ সত্য নয়। তবুও রোমানা বা যতীন কেউ কোনো উত্তর দেয় না। রোমানার বয়স বেশি, তিন কাল গিয়ে এক কালে পড়েছে, কথা হজমের শক্তিটা তার ভালোই।যতীন একটা বেসরকারী চাকরি করে। বৌমাকে তেমন সময় দিতে পারে না, কোনো শখ আহ্লাদই তেমন পূরণ হয় নি। বৌমা শহরের মেয়ে, তার ইচ্ছে তিতিনকে শহরের স্কুলে পড়াবে, শহরে একটা বাড়ি করবে। কিন্তু ঐ বেসরকারি চাকরি, যতীন তেমন পেরে উঠছে না। যতীনের এই ব্যর্থতায় রোমানা তৃপ্তি পায়। এই গ্রামের বাড়ি, পুরোনো দেওয়ালের গন্ধ, কলপাড়, তুলসীতলা তার খুব কাছের। এদের ছেড়ে যাওয়া কষ্টের।

বেশ রাত হয়েছে। রোমানার ঘুম আসছে না। বারান্দায় এসে বসলো। ঝকঝকে রাত, ওপাশ থেকে করবীর গন্ধ ছুঁয়ে যাচ্ছে, মৃদুমন্দ বাতাস আর জ্যোৎস্না বর্ষণরত চাঁদ। রোমানার ইচ্ছে করছে কিশোরীদের মত ছুটে বেড়াতে। দু হাত ছড়িয়ে খোলা আকাশের নীচে অজানা তালে নেচে উঠতে। এ রাতের সমস্ত স্নিগ্ধতা দিয়ে নিজেকে ধুয়ে ফেলতে, এই স্নিগ্ধতায় পারে তার সমস্ত একাকীত্বকে ধুয়ে ফেলতে, সমস্ত বিষণ্ণতাকে মুছে ফেলতে। তার গোটা জীবনের সাক্ষী এই চাঁদ। এমন এক পূর্ণিমায় শিশিরের হাত ধরে রোমানা বেরিয়ে এসেছিল। কত বয়স হবে? ষোলো সতেরো। শিশিরের গভীর ভালোবাসায় সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি ষোড়শী রোমানা। শিশির আদর করে ডাকত, রু। আজ রু বলে ডাকার কেউ নেই। মন্দিরে গিয়ে বিয়ে করেছিল। শিশিরের মত পুরুষের সংস্পর্শে এসে রোমানা খুশিতে মেতে উঠেছিল। ছেলেরাও ভালোবাসতে জানে, রোমানা বিশ্বাস করেছিল। বাড়িতে তিন দিদির পর সবার আদরের ছোট ভাই ছিল শিশির। রোমানাকে ঘরে আনায় কেউ-ই তেমন খুশি হয় নি। সংসারে টালমাটাল অবস্থা। সংসারের হাল ধরতে শিশির রোমানা শহরে গিয়েছিল। কোনো রকমে একটা বড়ো কাপড়ের দোকানে কাজ মিলল ওদের।

সকাল দশ টা থেকে রাত দশ টা পর্যন্ত ডিউটি। সামান্য মাইনে। তবুও ওরা হাল ছাড়ে নি। দিনের শেষে কাজ সেরে রোমানা যখন শিশিরের বুকে ঘুমোতো তখন নিজেকে রাজরানি মনে হত। শিশিরের ভালোবাসার উষ্ণতা রোমানাকে ভরিয়ে রাখত। দিনের শুরুতে রোমানা স্বপ্ন দেখত সুন্দর একটা গুছানো সংসারের। ওরা রোজ রাতে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করত। ঘরের পর্দা থেকে শুরু করে ছেলে মেয়ে পর্যন্ত। ছেলে মেয়েদের কথা শুনলে রোমানা লজ্জায় লাল হয়ে উঠত। কাজ শেষে বাড়ি ফিরে ওরা দুজন মিলে রান্না করত, এক সঙ্গে খেত। মাসের শেষে বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে যা বাঁচত তাই দিয়ে নিজেরা চালিয়ে নিত। এভাবে প্রায় সাত মাস যাবার পর রোমানা গর্ভবতী হয়। এতো বড়ো খুশির খবরেও ওরা দু‌জন দুজনকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিল। সন্তানকে তারা খাওয়াবে কী ? শিশির একাই কাজে যেত, ও রোমানাকে এ অবস্থায় আর কাজ করতে দেয় নি। গ্রামের বাড়ি পাঠাতে ভয় পাচ্ছিলো। তাই একাই রোমানার খেয়াল রাখত। অর্থের অভাব বেড়ে গেল কিন্তু ভালোবাসায় কোনো কমতি ছিল না। শিশির অর্ধেক খেয়ে রোমানার খাবার মুখে তুলে দিয়েছে। রোমানা শিশিরের ভালোবাসার পরশ পেত কিন্তু তার মনে হতো সংসার গুছিয়ে উঠতে না পারলে এ ভালোবাসার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটবে না।

ওদের কোল জুড়ে এল ফুটফুটে মেয়ে রিসু। রোমানার তখন ভরা সংসার। শ্বশুর, শ্বাশুড়ি, তিন ননদ, মেয়ে। ততদিনে সে বিদেশ পাড়ি দিয়েছে। সংসার গুছিয়ে উঠতে হবে তাকে। তিন দিদির বিয়ে দিতে হবে, চাষের জমিগুলো ছাড়াতে হবে, বাড়িটা সারাতে হবে। মেয়েকে সে কষ্টের মধ্যে বড়ো হতে দেখতে পারবে না। খুব তাড়াতাড়ি তাকে অনেকগুলো টাকা ইনকাম করতে হবে।

প্রথম দিকে রোমানা মেনে নিতে পারত না। এরপর আস্তে আস্তে সব সয়ে যায়। মেয়েকে বুকে জড়িয়ে রাত পার করে। আর অপেক্ষায় থাকত শিশিরের একটা টেলিফোনের। পাশের বাড়ির টুনুদির ল্যান্ড নম্বরে ফোন করত। সপ্তাহে একবার।

সপ্তাহের ঐ দিনটি রোমানার কাছে দূর্গাপুজোর আনন্দ এনে দিতো। রোমানা অপেক্ষায় থাকত। অপেক্ষারা হামাগুড়ি দিয়ে চলে, শেষই হয় না।

প্রথমবার শিশির যখন বিদেশ থেকে এলো রিসুর চার বছর বয়স। মেজদির বিয়েতে। সংসারের অবস্থা তখন অনেকটা সচ্ছল। সেই দিনটায় সারাটা দিন শিশির আত্মীয়দের নিয়ে ব্যস্ত থাকল। রোমানার মনে অভিমান জমেছিল। শিশির সবার জন্য কিছু না কিছু এনেছে অথচ রোমানার জন্য কিছুই না ! সে রাতে শিশির রোমানাকে নিজের মত সাজিয়েছিল, যেন নতুন বউ। রোমানা শিশিরকে আঁকড়ে ধরে কেঁদেছিল।

শিশির আর বিদেশ যেতে চায় নি। কিন্তু ছোটদির বিয়ে, বাড়ি সারাই তখনও বাকি। রোমানা বলেছিল লক্ষ্মীটি এবার যাও , তারপর আর না। প্রায় ছ‌ মাস পর শিশির আবার বিদেশ পাড়ি দিল। রোমানার গর্ভে তখন যতীন। আবার সেই অপেক্ষা ! রোমানা সংসার প্রায় গুছিয়ে উঠেছিল, চাষের জমি গুলো ফিরে পেয়েছে, নিজের পছন্দ মত ঘরের পর্দা টাঙিয়েছে। রিসু বড়ো হচ্ছে, যতীন সবে হাঁটতে শিখেছে। শিশির ছেলের মুখটা দেখার জন্য ছটপট করত। প্রতিবারই ফোনে বাড়ি ফিরে আসার কথা বলত। বাঁধ সাঁধত রোমানা। শিশির আর কয়েকটা বছর থাকো, তাহলে আমরা বেশ কিছুটা জমি জায়গা কিনে নিতে পারব। রিসু বড়ো হচ্ছে, ওর জন্য কিছুটা জমিয়ে রাখতে হবে।

দীর্ঘ বারো বছর পর শিশির দ্বিতীয় বার বাড়ি এল। মানুষটা কেমন পাগলের মত তার '‌রু‌' কে ভালোবাসত, বাচ্চাদের মতো রোমানার কাছে কেঁদেছিল। রোমানা পারেনি শিশিরকে আশ্রয় দিতে। তৃতীয় বারের জন্য শিশির আবার বিদেশে পাড়ি দিল। রিসুর বিয়েটা দিয়ে তারপর না হয় এক সঙ্গে থাকা যাবে। সে অপেক্ষা যন্ত্রণার, কিশোর বয়সের সেই অপেক্ষা তখন যৌবন পেরিয়ে বার্দ্ধক্যে এসে হাজির। হঠাৎ একদিন এমনই এক পূর্ণিমার চাঁদ জানান দিয়েছিল শিশির আর নেই। তারপর রোমানার ‌গুছানো সংসার‌ সংসারের নিয়মেই চলল। তার

গুছানো সংসারে এখন নিজেকেই কেমন বেমানান লাগে। সেদিন শিশিরকে সে আশ্রয় দিতে পারে নি, হয়ত বা চাই নি। তাই শিশির অভিমানেই চলে গেল? রোমানকে একা ফেলে ? এত স্বার্থপর ? টুনিদের বাড়ির টেলিফোন 'রুু'-র জন্য আর বেজে ওঠে না। রোমানা জানে, তার এই পরিস্থিতির জন্য সে নিজেই দায়ী। এখন শুধু অপেক্ষা, শিশিরের কাছে যাওয়ার। শিশিরের মান হয়তো এখনও ভাঙে নি, তাই সে আর রুু কে কাছে ডেকে নিচ্ছে না। তবুও রোমানা শিশিরের ডাকের অপেক্ষায় থাকে। তাই তো পূর্ণিমার চাঁদ তাকে ঘরে থাকতে দেয় না। চাঁদ যে তার আপনজন, বড়ো কাছের।

– মা, তুমি ঘুমোও নি? আবার বারান্দায় বসে আছো ?

যতীনের কথায় রোমানার সম্বিৎ ফেরে।–হ্যাঁ রে,ঘুম আসছিল না। আয় একটু পাশে বস দেখি।

– মা তুমি তোমার বৌমার কথায় কিছু মনে করো না। বয়স কম, কাকে কীভাবে কথা বলতে হয় জানে না। তাছাড়া তিতিনটা যা দুষ্টু হয়েছে। একা একা সবটা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যায়।

– ধুর বোকা । মায়েরা কখনও রাগ করে না।

– মা, আমি তো জানি, আমাকে নিয়ে চিন্তায় তোমার ঘুম হয় না। কিন্তু মা, তোমার চিন্তার দিন শেষ হতে চলেছে।

– তাই ?

– হ্যাঁ মা । আমার মামা শ্বশুর বিদেশে থাকে। আমাকে পাসপোর্ট করে চলে আসতে বলেছে, সব ব্যবস্থা উনি করে রেখেছেন ওখানে। ওখানে কটা বছর কাটিয়ে আসলেই সব সেট হয়ে যাবে। তিতিনটাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করতে পারব।

– কিন্তু... তোর বাবা...

–মা, তুমি চিন্তা করো না। বাবা কী কাজ করত ঠিকমত আমরা জানতাম না। আর আমি তো সেখানে কোম্পানির হয়ে কাজ করব। চিন্তার কিছু নেই। যাও, ঘুমিয়ে পড়ো।

আবার শুরু অপেক্ষার ।

আমি মানবতা বলছি

শুভ আহমেদ

আমার দিকে নজর রাখো, বন্দুক যেমন তাক করে রাখা হয়

ঠিক ঐ রকম করেই তোমাদের চোখ স্থির করো আমার ওপর!

দেখো আমার গতিবিধি !

ইদানিং তিন রাস্তার মাথায়, স্কুলটির বাচ্চারা সপ্তাহে একদিন আমাকে কেমন অবাক হয়ে দেখে।

অথচ, ওদের কিশোরী বোন আর ভাইদের সাথে

ছিল আমার ভীষণ সখ্যতা

কারো কারো পিতার সঙ্গেও

কিন্তু আমার একটি সুন্দর যৌবন থাকা সত্ত্বেও আমি জনক হতে পারি নি

কারণ, কার্তিকেয় চাঁদে মুক্ত আকাশের নিচে উলঙ্গ থাকি, ওটা হয় আমার দোষ !

তবে বোমারু বিমানের দল এলে, বোমা নিক্ষেপে উচ্ছ্বাস পেলে, পাপ হয় না নিশ্চয়?

পাপ তো হতে পারে সমবেত ভালোবাসায় !

বিষ-ফোঁড়া

রঞ্জন পাড়ুই

‘উদারতা’র চুমুর বিষে বহুযুগ ককায়
আর কি সহ্য হয়, শক্ত নেতা চাই
বলশালী দশাসই পালোয়ানি ছাতি

পালোয়ানের স্বপ্ন-ফেরির বিজ্ঞাপনে
কোথাও দেখিনা নিজেকে কোনো খানে
যন্ত্রণাটা ঢেকে ঢেকে রাখি
নিজের পাপ, তাই আর কি

কতদিন, কতদিন ক্ষত ঢেকে রাখা যায়
আরও কিছু দিন, যতদিন গা-সহায়
‘উদারতা’ সে তো ভালই ছিল সই
পালোয়ানি ঘায়ে সব টুকরো টুকরো হই

বন্ধু এসো হৃদয়ের কথা বলি
কৃষ্ণার্জুন আলাপে পথের খোঁজে পথ চলি

পাঠকের কলম

প্রিয় সম্পাদক,

‘ভয়েস মার্ক’, মার্চ-এপ্রিল, ২০১৯ সংখ্যাটি পড়লাম। মো.ফিরোজ হোসেন সম্পাদিত এবং লালগোলা, মুর্শিদাবাদ থেকে প্রকাশিত ৫৮ পৃষ্ঠার এই পত্রিকাটিতে পাঁচটি বিভাগে মোট ষোলোটি লেখা রয়েছে। সম্পাদকীয়, দুটো সাম্প্রতিক ইশ্যু, ছয়টি প্রবন্ধ, পাঁচটি গল্প এবং দুটো কবিতা।

‘ভয়েস মার্ক’ নামটিই ব্যতিক্রমী এবং অতীব আকর্ষক। পড়ে বোঝা গেল লেখাগুলোও কম আকর্ষক নয়। ছয়টি প্রবন্ধের পাঁচটিই বিতর্কাতীত ভাবে এক কথায় অনবদ্য। কিন্তু ‘আর্থ সমাজ জীবনে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার কারণ’ শিরোনামে ইমদাদুল হক এর প্রবন্ধটিতে বেশ বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। তা সত্ত্বেও বলা যায়, লেখাটির মধ্যে মুসলিমদের বাস্তব পশ্চাৎপদতার বিবরণটি নিদারুণ ভাবে চিত্রিত। আযাদ রহমান তাঁর ‘জাকাত প্রযুক্তি : ইতিহাসের অতীত ও বর্তমান’ প্রবন্ধে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জাকাত বিষয়ক আলোচনাটি এত সুন্দর করেছেন, নিঃসন্দেহে তা অভূতপূর্ব। অনুপম পালের ‘সবুজ বিপ্লব থেকে অতি সবুজ বিপ্লব‘ প্রবন্ধটি এই পত্রিকার একটি মূল্যবান সম্পদ। দেশের বুকে হাহাকার! যদিও দুর্ভিক্ষ নেই। কিন্তু দুর্ভিক্ষের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই দেশ! লেখক খুব সুন্দর করে প্রতিভাত করেছেন দুর্ভিক্ষ সংক্রমণের প্রেক্ষাপটটি। অন্য দেশ কীভাবে আমাদের দেশে এসে মুনাফা লুটছে বাণিজ্যের দোহাই দিয়ে এবং দেশের সর্বনাশ করে চলেছে এবং এই ষড়যন্ত্রে নেতৃস্থানীয়রা কীভাবে মদত জুগিয়ে চলেছেন!

পাঁচটি গল্প রয়েছে পত্রিকায়। গল্পগুলোতে ছাপার অনেক গোলমাল চোখে পড়ল। পড়তে পড়তে তাই ভীষণ বিরক্তি লাগছিল। তবুও বৈশালী রায় চৌধুরীর ‘তাসের ঘর’ এবং বরুণ শ্যেনের ‘দ্বন্দ্ব’ গল্প দুটি অসাধারণ লাগল।

দুটো কবিতাও রয়েছে কবিতা বিভাগে। দুটি কবিতাই আধুনিক ধাঁচে লেখা। কবিতা দুটোকে ভালো বলা গেলেও, ঠিক উৎকৃষ্ট বলা যায় না। কেননা সুখপাঠ্য ও চমকপ্রদ নয়।

সব শেষে যে দুটো বিষয় নিয়ে বলতে চাই তা হল সম্পাদকীয় এবং সাম্প্রতিক ইস্যু। কোনো তৈল মর্দন নয়। নয় কোনো ছলচাতুরী। একদম চলমান সমাজ বাস্তবতার চিত্র 'সম্পাদকীয়'র পাতায়। চাষাবাদ, কৃষকের আত্মহত্যা, বেকারত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলো বেশ জোরালো ভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। ‘সাম্প্রতিক ইস্যু’ বিভাগে ‘বেকার সমস্যা : এসএসসি কর্মপ্রার্থীদের অনশনের প্রেক্ষিতে’ এবং ‘শিক্ষায় মূল্যায়ণ ব্যাবস্থাপনা’ পাঠক পড়লেই চোখের সামনে অবিরত ঘটে চলা ঘটনাগুলোই দেখতে পাবেন। খুঁজে পাবেন এসব ঘটনার আড়ালের পঙ্কিল চিত্রটিও।

লিটল ম্যাগাজিন বের করা যে কী পরিমাণ সমস্যাসঙ্কুল তা যারা একটু খোঁজ রাখেন তাঁরাই জানেন। তবুও কিছু ভুল,কিছু দুর্বলতা এমনবিধ সমস্ত প্রতিকূলতাকে বুকে ধারণ করেও ‘ভয়েস মার্ক‘ এর এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অনবদ্য, বলিষ্ঠ এবং সময়োপযোগী। পত্রিকাটির মূল্য মাত্র ২০ টাকা। এই দুর্মূল্যের বাজারে এত স্বল্প মূল্যের এমন একটি পত্রিকা সত্যই বিরল! পত্রিকার দীর্ঘায়ু কামনা করি।

মুরসালিম শেখ
বোরাকুলি, ইসলামপুর

আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েত

ভগবানগোলা ♦ রাণীতলা ♦ মুর্শিদাবাদ

প্রধান: রীনা বিবি	মোবাইল: ৬২৯৬৩২১০৩৮
উপপ্রধান: সুজিত মণ্ডল	মোবাইল: ৯৯৩২৩৭৯৭১৩

আমাদের লক্ষ্য:-

১।　পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েত।

২।　সকলের অংশগ্রহণে শক্তিশালী গ্রাম পঞ্চায়েত।

৩।　সংসদ সভায় অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে সংসদের সমস্যা সমাধান।

৪।　নারী পাচার, শিশু পাচার, শিশুশ্রম ও বাল্যবিবাহ রোধ।

৫।　১০০ দিনের কাজের আওতায় সকলের হাতে কাজ, মুখে ভাত।

৬।　অসহায় মানুষের উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা।

আমাদের সাফল্য:-

১। বিভিন্ন অর্থ তহবিলের মাধম্যে বছরে ১কোটি টাকা খরচ করে ঝকঝকে ঢালাই এবং পিচ রাস্তা ও পরিশোধিত পানীয় জলের ব্যবস্থা।

২। আমডহরা গ্রাম পঞ্চায়েত সদা সর্বদা আপনার কাছে ও পাশে রয়েছে।

M/S, MAITY CONSTRUCTION

Government Contractor & General Order Suppliers

Prop:- DIPALI MAITY (DUTTA)

Land Ph: 03210-255079
Mob: 9679265517

VILL- BANGHERI ♦ P.O + P.S- KAKDWIP ♦ DIST- S. 24 PARGANAS

Issue date 25 April 2019.
Vol. 1, Issue 2 Voice mark

আজ বিশ্ব মূল্য বৈষম্যে ভারসাম্যহীন। সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব ও রাজনৈতিক দিশাহীনতায় শ্রমমানস অস্থির। তার লক্ষ্য নির্ণয়ে ব্যর্থ। এই সংকটাপন্ন পটভূমিতে শান্তি লক্ষ্যে-১। অস্তিত্ব: প্রবেশিকা (২১টি প্রবন্ধ) ১৫০. ২। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: এক) ২০০. ৩। মানুষ: দেহপূর্ব, দেহান্তপূর্ব এবং... (বর্তন ক্রম: দুই) ২০০. ৪। দেহমনের নিয়ন্ত্রণ এবং... ১২০ ।

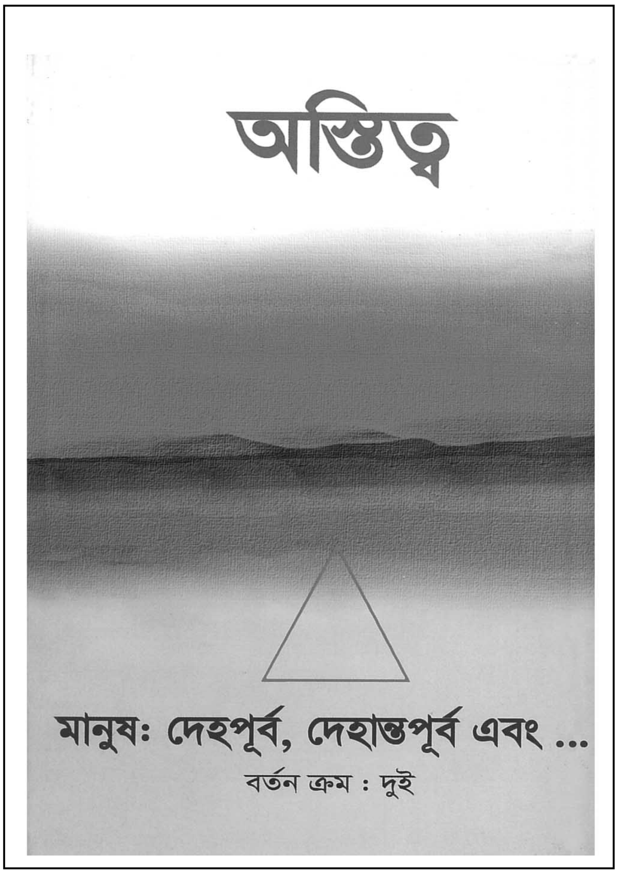

প্রকাশক: গাইডেন্স ফাউন্ডেশন
ফোন: ০৩৩-২২৮০-৬৭০৯/৫৫০৫
১৯৭ পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৭, (পার্ক সার্কাস ময়দানের পাশে)

Published by Md. Firoz Hossain from Pirtala, Upar Fatepur, Lalgola, Murshidabad, Pin-742148 and printed by him at M/s. KIS Offset Press, Berhampore, Murshidabad, Pin-742101.